আমরা তিন প্রেমিক
ও
ভুবন
বিমল কর

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

বিমল কর

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট / কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
মুদ্রক
মথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০ ডবলু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু

সোপান / আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

প্রথম টাঙ্গায় বাবা, মা ; পরেরটায় দিদি আর পুষ্প। শেষের গাড়িটায় আমরা দু'জন—হেমদা আর আমি। টাঙ্গায় ওঠার সময় হেমদাকে আমরা দিদির গাড়িতে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলাম একবার; পুষ্প রগড় করে বলেছিল, "যান না, জোড় বেঁধে বসুন গে যান, এখানে কেন!" পালটা রসিকতা করে হেমদা বলল, "দেখো ভাই, প্রত্যাশার জন্যে মানুষ সামনের দিকে চায়, আমি ও-গাড়িতে বসলে আমায় যে পিছু দিকে চাইতে হবে" ; বলে হেমদা পুষ্পর চোখে চোখ রেখে হাসল। পুষ্প কথাটার মানে বুঝতে মুহূর্ত সময় নিল, তারপর হেমদার হাতে চিমটি কেটে দিল জোরে, বলল—"আ—হা!"

আমাদের টাঙ্গা তিনটে প্রায় ঘণ্টা খানেক হলো ছুটছে। বাবা-মা'র গাড়িটা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে ভাল গাড়িটায় ওঁদের বসানো হয়েছে; ভাল ঘোড়া, ভাল গদি না হলে বাবা-মা'র কষ্ট হতো। প্রথমত ওঁদের বয়স হয়েছে, দ্বিতীয়ত, বাবা আজ সাত-আট বছর নিজের বাড়ির অস্টিন গাড়ি ছাড়া অন্য কিছুতে চলাফেরা

করতে অভ্যস্ত নন। আজকের এই হুজুগে আমরা ওঁদের জোর করে টেনে এনেছি।

দিদি আর পুষ্পর গাড়িটা মন্দের ভাল। টাঙ্গার ঝাঁকুনি দিদির সয় না; ভারী শরীরে টাল সামলাতে কষ্ট হয়, কখনো কখনো আঁতকে চেঁচিয়ে ওঠে। দিদিদের গাড়িটাকে তাই ধীরেসুস্থে চালাতে বলে দেওয়া হয়েছিল। ওরা আমাদের খানিকটা আগে আগে যাচ্ছে।

শেষের গাড়িটা একেবারে লঝ্‌ঝড়। যেমন গাড়ি, তেমনি ঘোড়া। নড়বড়ে শরীরে শব্দ করতে করতে, আমাদের দু'জনকে কখনো ডাইনে টলিয়ে দিয়ে, কখনো বাঁয়ে হুমড়ি খাইয়ে গাড়িটা চলেছে। হেমদা মাঝে মাঝে বলছে, "অন্তু, নার্ভাস হয়ো না; মহাপ্রস্থানের পথের এটা প্রাইমারি প্রিপারেশান।"

আমরা পঞ্চপাণ্ডব নই, মহাপ্রস্থানেও যাচ্ছি না। আমরা মজুমদার ফ্যামিলি ঃ সুরেশ্বর মজুমদার, তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা এক পুত্র এবং জামাতা—এই মিলিয়ে আমরা ছ'জনে একটি গোটা পরিবার আপাতত চলেছি একটি স্তম্ভ দেখতে; প্রাচীনকালের স্তম্ভ।

শীতের রোদ খুব ঘন এবং হলুদ হয়ে এসেছে; যেন সকাল থেকে নীল অনন্ত আকাশে মাঘের রোদ জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল, ফুটে ফুটে এখন তা ঘন ও ঠাণ্ডা হয়ে পুরু একটা সর পড়ে গেছে রোদের। দুপুর শেষ হতে চলল। পাহাড়ী বনপথের মেঠো রাস্তা ধরে আমাদের টাঙ্গা তিনটে ছুটছে; ঘোড়ার গলায়-বাঁধা ঘন্টির মালা ঝুনঝুন শব্দে বাজছে সর্বক্ষণ; মনে হবে আমরা যেন কোনো প্রাচীন কালের তীর্থযাত্রী।

এখন আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি, তা যেন পাহাড়তলীর মতন। নির্জন, নিস্তব্ধ। চোখ মেলে দেখছি, কোথাও ঢালু জমি নদীর চরের মতন আদিগন্ত ছড়ানো, ছোট বড় পাথরের বিক্ষিপ্ত স্তূপ, ঝোপঝাড়; কখনো চোখে পড়ছে অরণ্যের হরিৎ-শ্যাম পটচিত্র, আকাশ-মাটির

মাঝখানে দৃষ্টি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কখনো উত্তরে, দূরান্তে পাহাড়টি দেখতে পাচ্ছি, রৌদ্রকিরণ এবং মেঘপুঞ্জের জন্য তার মাথায় ধোঁয়ার জটা। কদাচিৎ একটি গ্রাম, কাঠুরিয়ার বয়েলগাড়ি এবং ছোলার ক্ষেত চোখে পড়ছিল।

হেমদা বলল, "অন্তু, আমরা বেরাস্তায় চলে আসিনি তো? কোথায় সেই 'কেপ অফ্ গুড হোপ'! চোখে পড়ছে তোমার?"

হেমদা যেদিন থেকে এই স্তম্ভটার কথা শুনেছে সেদিন থেকেই ওটাকে 'কেপ অফ্ গুড হোপ' বলে আসছে। আমি অনেকবার বলেছি, "তুমি কেপ পাচ্ছ কোথায়, হেমদা! ত্রিপাঠীবাবুর কথামতন ওটা টাওয়ার, টাওয়ার অফ্ গুড হোপ বলতে পার।" দিদি বলেছে, "সোজাসুজি মিনার বলো না, বাপু! যা বুঝছি তাতে ওটা মনুমেণ্ট কি মিনার-টিনার হবে।" দিদির কথায় পুষ্প আর হেসে বাঁচেনি, বলেছে, "শুনছ ওটা কোন আদ্যিকালের সৃষ্টি, লোকে তখন মিনার-টিনার বুঝত না। তার চেয়ে এরা যা বলে তাই বলো।"

এরা যা বলত তাতে আমরা কৌতুক বোধ করতাম। এরা বলত 'মন্‌দিব'। সরল, দেহাতী মানুষগুলোর কাছে ইটের ঢিবি মাত্রেই মন্দির। ত্রিপাঠীবাবু অবশ্য বলেছিলেন, অনেকে একে 'নভস্‌তি' বলে। কথাটা আমরা বুঝিনি প্রথমে, পরে বুঝলাম: কোনো কালে কেউ সংস্কৃত ভাষায় বুঝি বলেছিল নভে অস্তি, তাই থেকে নভস্‌তি। অর্থাৎ মিনার চূড়া যেন আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে, শূন্যে ভাসছে।

ত্রিপাঠীবাবু আমাদের নভস্‌তির গল্পটা শুনিয়েছিলেন। তার আগে পুষ্প শুনেছিল মতিয়ার কাছে।

মতিয়া এ বাড়ির চাকর, এখানকারই লোক। আমরা আজ পক্ষকাল এখানে। সপরিবারে বেড়াতে এসেছি। ব্যবসাসূত্রে বাবার পরিচিত কেউ তাঁকে এই স্বাস্থ্যকর নির্জন জায়গাটির কথা বলেছিলেন। বাড়িও তিনি যোগাড় করে দিয়েছেন। এসে পর্যন্ত আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধে ভোগ করতে হয়নি। বাবা

পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, মা সংসার দেখছিলেন, আর আমরা চারজনে—হেমদা, দিদি, পুষ্প আর আমি এখানের প্রচণ্ড শীতে যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়ে, নদী ও ঝরনা দেখে, হাটমাঠ করে, খেয়ে ঘুমিয়ে, তাস খেলে দিন কাটাচ্ছিলাম। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ সংলগ্ন এই মনোরম, নির্জন ও নির্বান্ধব জায়গাটি ভাল লাগলেও ক্রমশই আমরা উত্তেজনাহীন হয়ে উঠছিলাম। হেমদা না থাকলে হয়তো এত নির্জনতা সহ্য করা যেত না।

এমন সময় একদিন মতিয়ার কাছে এক গল্প শুনে পুষ্প বলল, "এখান থেকে খানিকটা দূরে এক মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মাথায় চড়লে একেবারে স্বর্গ।···চলো, একদিন স্বর্গ বেড়িয়ে আসি।"

হেমদা বলল, "স্বর্গের জন্যে বাইরে ছুটব কেন ভাই, আমার হাতের কাছে ডবল স্বর্গ রয়েছে।"

পুষ্প ছুটে এসে হেমদার মাথার চুল ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল; বলল, "ইস্—মানুষের একটা হয় না, আপনার আবার ডবল।"

হাসি-তামাশার মধ্যে পুষ্প আমাদের কাছে মতিয়ার কাছে শোনা গল্পটা বলল। শুনে আমরা হেসে বাঁচি না। কোন এক রাজা নাকি রামজীর বড় ভক্ত ছিল, বহুকাল সুখে শান্তিতে রাজত্ব ও প্রজাপালন করে শেষে বুড়ো বয়সে ছেলের হাতে রাজাপাট তুলে দিয়ে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করল। রামভক্ত সেই ধার্মিক রাজা বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, সাধনভজন করে, তার সঙ্গে না আছে পাত্রমিত্র না সৈন্যসামন্ত। ঘুরতে ঘুরতে রাজা একদিন এল মহাদেও পর্বতমালার কাছে; চেয়ে দেখল বিরাট পর্বত, আকাশ ছাড়ানো মাথা; ভাবল, ওই পাহাড় বেয়ে সে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতন এবার স্বর্গে চলে যাবে। পাহাড় চড়া শুরু হলো তার। রাজা বড় ভুল করেছিল, পাহাড়ে চড়ার আগে পুজো দেয়নি পর্বতের, তাই পর্বত তাকে নিল না, ফেলে দিল। রাজার পা গেল ভেঙে, হাত ঠুঁটো হলো। তখন সেই

অক্ষম রাজা তার রামজীকে ডেকে বলল ঃ আমি চিরকাল তোমার পুজো করে এসেছি, আর কারও পুজো করব না ; তুমি আমায় স্বর্গে ওঠার পথ যদি করে দাও তবে যাব, নয়তো পড়ে থাকব এইখানে। রামজী তখন ওই মন্দির করে দিলেন—ভক্তের জন্যে ; বললেন ঃ তোমার ভাঙা পা ভাঙা হাতেই তুমি ধীরে-সুস্থে ওই সিঁড়ি ধরে উঠে আসবে, আমি তোমার জন্যে পাহাড়ের চেয়ে উঁচু মন্দির বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মন্দিরে ঢুকলে আর ফিরতে পারবে না। রাজা তখন রামজীর পুজো করে ওই মন্দিরে ঢুকল, তারপর আর মন্দিরের বাইরে আসেনি।

হেমদা হেসে বলল, "রামচন্দ্রের অপার মহিমা। সাগর বাঁধতে পারেন, আর রাবণের ওপর টেক্কা মেরে স্বর্গের সিঁড়ি করতে পারবেন না !···যাই বলো, এইসব সরল মানুষের ইমাজিনেশান বড় সাদামাটা, সুন্দর।"

তারপর আমরা একদিন ত্রিপাঠীবাবুকে কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ রামজী-টামজী না ভাইয়া, কোই হিন্দু রাজা ওটা বানিয়েছিল। দুসরা এক কিস্‌সা আছে, শুনুন।

ত্রিপাঠীবাবুর গল্পে ইতিহাসের একটু গন্ধ ছিল, যদিও তা কাহিনী। এক হিন্দু রাজার তৈরী ওই নভস্‌তি ; কি তাঁর নাম, কিবা তাঁর পরিচয়, আজ আর জানা যায় না। কিংবদন্তী বলে, তিনি ছিলেন সাহজাহান বাদশার সমসাময়িক। রাজা আবার স্বয়ং একজন দক্ষ স্থপতি। একবার তিনি তাঁর অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী যুবতী মহিষীকে সঙ্গে করে মহাদেব পর্বতমালায় পুজো দিতে এসেছিলেন। ফেরার পথে রাজারানী বনাঞ্চলে বিশ্রাম নিচ্ছেন, অপরাহ্ণ বেলা, অদূরে তাঁর সৈন্যসামন্তরা ক্লান্তি বিনোদন করছে, বসন্তকাল, বনভূমি নব পত্রপল্লবে সজ্জিত, রাজার এই স্থানটি নয়নে ধরে গেল। রানীও বিমোহিত। রাজা রানীকে বললেন, তোমার সৌন্দর্যের স্মৃতিতে এখানে একটা কিছু গড়ে দিতে চাই, বলো কি ইমারত গড়ব ? রানী

বললেন, আমার ছুটো শর্ত আছে, যদি শর্ত রাখেন, তবে প্রার্থনা জানাই। রাজা হেসে বললেন, রাখব শর্ত। তখন রানী ছুই শর্ত দিলেন। রাজাকে স্বহস্তে একটি মিনার তৈরী করে দিতে হবে; আর দ্বিতীয় শর্ত—যতদিন না রানী সন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, তিনি তৃপ্ত, ততদিন রাজাকে মিনারের উচ্চতা বাড়িয়ে যেতে হবে।···রাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন, রানীর ইচ্ছা মতনই কাজ হবে।···তারপর ওই নভস্‌তির কাজ শুরু হলো, রাজা নিজে নকশা বানালেন মিনারের, তদারকি করতে লাগলেন কাজের, আর মিনার মাথা তুলতে লাগল। মিনারের একটি করে তল শেষ হয়, রাজা নিয়ে আসেন রানীকে, ছু'জনে উঠে এসে দাঁড়ান শেষ চত্বরে, রাজা শুধোন, তুমি তৃপ্ত? রানী বলেন—না; তিনি তৃপ্ত নন। আবার মিনারের উচ্চতা বাড়ানোর কাজ শুরু হয়, রানী ফিরে যান রাজপুরীতে। এমনি করে সাত বছরে সাতটি চবুতর বা তলা তৈরী হলো। রানী আসেন, শীর্ষে উঠে দেখেন চারপাশ, তারপর মাথা নেড়ে বলেন, তিনি এখনো তৃপ্ত নন।···আস্তে আস্তে বছর যায়, রাজা বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে পড়েন, রানীও বিগতযৌবনা। অবশেষে রাজা শেষ তল তৈরী করে রানীকে ডেকে পাঠালেন। তারপর ছু'জনে মিনারের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আর ফিরে আসেননি। বা রাজা তাঁকে ফিরতে দেননি।

"আর রাজা?" আমি ত্রিপাঠীবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ত্রিপাঠীবাবু বলেছিলেন, "ভাইয়াজী, রাজাভি নেহি লোওট আয়া। মালুম মনোরথ পূরণ হো গ্যয়া, সুখ মিলা শান্তি মিলা।"

কাহিনী শুনিয়ে ত্রিপাঠীবাবু আমাদের বলেছিলেন, আমরা যখন বেড়াতেই এসেছি, তখন একবার ঘুরে যাই না কেন নভস্‌তি। গল্পকথায় কত কি তো বলে, তাতে কি যায় আসে! "আগর যাইয়ে গা তো বহুৎ আনন্দ্‌ মিলে গা, আসমান উঁচা ওহি নভস্‌তি; অন্দর ভি ভারী মনোরম।"

হেমদা জিজ্ঞেস করল, 'লোকে বেড়াতে যায় না? মিনারে চড়ে না?'

ত্রিপাঠীবাবু বললেন, "কেউ কেউ যায় বটে, এখানকার কথা ক'জন আর জানবে বলুন! তবে যারা বা মিনারে চড়তে যায় তারাও সামান্য উঠে ফিরে আসে, ভয় পায়, ঠকে যায়।"

ত্রিপাঠীবাবুর গল্প শোনা হয়ে গেলে আমরা অন্য কোথাও কিছু দেখতে যাবার মতন না পেয়ে ওই নভস্তি বা মিনারটি দেখতে যাওয়া স্থির করলাম।

হেমদা বলল, "কত আর উঁচু হবে—, গল্পের গরু গাছে ওঠে। আর যদি একটু উঁচুই হয়—ক্ষতি কি—ঘষড়ে-টষড়ে উঠে যাব, তারপর না হয় বিছানায় শুয়ে পায়ে তেল মালিশ চালাব। চলো পুষ্প, মনস্কামনা পূর্ণ করে আসি। টপে চড়লে তো আর তোমায় আমায় ফিরতে হবে না।" হেমদা হাসতে লাগল।

দিদি হেসে বলল, "আমায় বাপু তা বলে ঠেলে ফেলে দিও না।" হাসিশেষে দিদির মুখে একটু বা লুকোনো বিষাদ নামল।

আমরা আজ ছ'জনে—সুরেশ্বর মজুমদার এবং তাঁর পরিবারবর্গ—মাঘের দুপুরে টাঙায় চড়ে সেই মিনার দেখতে যাচ্ছি। বাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না যাবার, মা-ও নিমরাজী ছিল। আমরা একরকম জোর করেই তাঁদের দলে টেনেছি। এই ভ্রমণ অন্তত তাঁদের খারাপ লাগার কথা নয়।

হেমদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "অন্তু, ওই যে—ওই, নর্থের দিকে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ!"

উত্তরের দিকে তাকিয়ে আমি একটি ধূসর মিনার দেখতে পেলাম।

২

আমরা মিনারের কাছে এসে দাঁড়ালাম। টাঙা তিনটে চড়াইয়ের নীচে। এতক্ষণে সূর্য হেলে পড়ছে; পশ্চিমের দিকে সামান্য একটি

চালা। ওই চালার সামনে একটি গ্রাম্য কূপ। অল্প তফাতে বুঝি একটি গ্রাম আছে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রাম। চালাবাড়িতে কেউ ছিল না, ঘরের মধ্যে একটি ধুলোভরা খাতা, কয়েকটি অর্ধদগ্ধ মোমবাতি পড়ে আছে। টাঙ্গাঅলারা বলেছিল, আপনারা যান, আমরা দরোয়ানকে ডেকে আনছি।

মিনারের চারপাশে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, বাবা বললেন, "পুরনো টাওয়ার, তবে খুব পুরনো নয়। শ' দুই-আড়াই হতে পারে।"

মা বললেন, "জায়গাটি বড় নিরিবিলি। মন জুড়োয়।"

পুষ্প মাথা তুলে হাঁ করে মিনারের চূড়া দেখছিল, বলল, "দাদা দেখ, মনে হচ্ছে মিনারের মাথাটা হেলে পড়ছে, এক্ষুনি হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ে পড়বে।"

হেমদা বলল, "ইলিউসান অফ ভিস্যান।"

সুবিশাল মিনার, তলার দিকটা জরাজীর্ণ দেখায়, ফাটলে ফোকরে গুল্ম ও লতাপাতা, চাপড়া চাপড়া ঘাস। মাথা তুলে মিনারের উচ্চতা দেখে আমার মনে হলো না, স্থানটি অনধিগম্য। শীতের আকাশ আরো নীল, আরো স্বচ্ছ হয়ে এসেছে, একটি হালকা মেঘখণ্ড চূড়ার মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। হু হু বাতাস বইছে। বনানীর গন্ধ সেই বাতাসে।

লোকটা এল ; এখানকার তদারকি করে ; প্রায়-বুড়ো। বোঝা গেল, পিছনের গ্রামটিতে থাকে, কদাচিৎ কোনো ভ্রমণকারী এসে পড়লে তার চালাঘরের খাতাটি দেখায়, মোমবাতি বেচে। আমরা মোমবাতি নিলাম না, হেমদা টর্চ এনেছিল সঙ্গে করে। মিনারে ঢোকবার সদর দরজাটির তালা সে খুলে দিল। বিশাল দরজা, বিরাট তালা।

হেমদা পরিহাস করে বলল, "ভেতরে ভয়ের কিছু নেই তো? সাপ-খোপ?"

মাথা নাড়ল বুড়ো, বলল, "অত উঁচুতে সাপ-খোপ যাবে কি

করে! সাপ নেই, শের নেই, ভাল্‌লু নেই। মিনারের নীচুর দিকে পাখির বাসা, পাখি দু' চারটে থাকতে পারে, পতঙ্গ দু' পাঁচটা।"

দরজা দিয়ে ঢোকার সময় হেমদা হাসিমুখে আবার শুধালো, "ওপরে উঠতে কতক্ষণ লাগবে জী?"

বুড়ো হেমদাকে দেখল কয়েক পলক, আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে মিনার দেখাল, নাকি আকাশ, বলল, "রামজীকে মালুম।"

বাবা দরজা দিয়ে প্রথমে ভেতরে গেলেন, তারপর মা; দিদি গেল, পুষ্প গেল; হেমদা আমায় ঠেলা দিল, আমি হেমদাকে আগে এগুতে দিয়ে পরে একবার বাইরের দৃশ্যাবলী এবং সেই বৃদ্ধের মুখ চকিতে দেখে নিয়ে মিনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম।

বাইরের অফুরন্ত আলো এবং রোদ থেকে বদ্ধগৃহে আসায় সহসা মনে হলো, সমস্ত আলো দপ করে নিবে গেছে। অন্ধকার যেন অভেদ্য। সামান্য সময় আমরা নড়াচড়া না করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি যথাসাধ্য চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক করে যখন এই অন্ধকার সইয়ে নিচ্ছি তখন আমার মনে হলো, আমার এবং হেমদার, হেমদা এবং দিদির, বাবা মা পুষ্প—আমাদের সকলের মধ্যে কেমন একটি ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে, আমরা প্রত্যেকেই পৃথক। অদ্ভুত কোনো অন্ধকার যেন আমাদের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে নদীর স্রোতের মতন বয়ে যাচ্ছে।

বাবা সামান্য কাশলেন, তারপর পা বাড়ালেন; তাঁর হাতে ছড়ি ছিল, ছড়ির শব্দে বুঝলাম তাঁর চোখে এই আকস্মিক অন্ধকার সয়ে গেছে, তিনি এগুতে শুরু করেছেন।

মা, দিদি, পুষ্প একে একে এগিয়ে যেতে লাগল। আমার চোখে অন্ধকার সয়ে গেল; বাবা, মা, হেমদা—সকলকেই দেখতে পেলাম। যে অন্ধকার অভেদ্য মনে হয়েছিল, সে অন্ধকার যে কিছু না, নিতান্ত দৃষ্টিবিভ্রম, এখন তা অনুভব করে খুব সহজেই পা বাড়ালাম।

বাবা, মা, দিদি, পুষ্প—সকলেই কথা বলছিল। আমরা সামান্য

এগিয়ে যেতেই আলো পেলাম, নীচের বৃহৎ গোল চত্বরটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো।

হেমদা বলল, "অস্তু, কীভাবে ভিত তুলেছে, দেখেছ! কত বড় সারকামফারেন্স! মনে হচ্ছে যেন বিরাট একটা গোল পুকুর কেটে বেঁধেছে।"

বাবা সামান্য কাশছিলেন, দিদিও গলা পরিষ্কার করছিল। নীচের বাতাস বড় ভারী, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কত কালের বাতাস যেন এখানে চুপ করে বসে বসে নিজেকে ক্রমশ একরকম প্রাচান গন্ধ দিয়েছে, যে-গন্ধ আলোয় ও বাতাসে পরিশুদ্ধ নয়।

বাবা আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন, পাশে মা, মা'র প্রায় গা ঘেঁষে দিদি। আমরা পেছনে।

দিদি বলল, "বাবা, তোমার কষ্ট হচ্ছে ?"

"হয়েছিল একটু, এখন সয়ে আসছে।"

"দেখতে পাচ্ছ ? টর্চ দিতে বলব ?"

"এখন পাচ্ছি। ওপর থেকে আলো আসছে।"

ওপর থেকে আলো আসছিল। আমরা প্রথম সোপানের মুখে এসে দাঁড়ালাম।

"জামাইবাবু—" পুষ্প ডাকল।

"বলো।" হেমদা জবাব দিল।

"সিঁড়ি গুনবেন নাকি ?"

"ওঠার সময় নয়।"

"কেন !"

"ওপরে ওঠার সময় কখনো শেষ দেখতে নেই, উদ্যম নষ্ট হয়", হেমদা হালকা গলায় বলল। "সিঁড়িও গুনতে নেই ঠিক ওই কারণে।"

বাবা সোপানে পা দিয়েছেন, মা বললেন, "পারবে তো ?"

"তোমাব কি মনে হচ্ছে পারব না ?" বাবা কেমন গলায় যেন বললেন।

মা বোধ হয় একটু লজ্জা পেলেন। "অভ্যেস তো নেই। আস্তে ওঠো।"

"আমি ঠিক উঠব। তুমি সামলে এস।" বাবা যেন অনেকটা আত্মবিশ্বাসের জোরে নিজের আরোহণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন। তারপর সামান্য বুঝি পরিহাস করে দিদিকে বললেন, "রেণু, তোমার মা'র একটা হাত ধরো।"

দিদি বোধ হয় মা'র হাত ধরতেই যাচ্ছিল, মা বললেন, "ছাড়, এত চওড়া সিঁড়ি, সবাই উঠছে আমি পারব না!"

বাবা মা দিদি সোপান উঠছে, আমরা পিছু পিছু। আশ্চর্য, প্রথমে যখন ভেতরে ঢুকেছিলাম তখন এই কূপসদৃশ বদ্ধ ইমারতের কোনো দিশে পাইনি। এখন আমাদের সামান্যই অসুবিধে হচ্ছে। সোপানের ধাপগুলি মিনারের গা বেয়ে বুঝি চক্রাকারে উপরে উঠে গেছে। ক্রমশই অনুভব করছিলাম, কয়েকটি চক্রাকার সিঁড়ির আবর্তের পর একটি করে তল; অনুমান করতে পারছিলাম, প্রতি তলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার পথ ও অলিন্দ আছে, কেননা আমরা বাইরে থেকে প্রাচীর দেওয়া অলিন্দ দেখেছি। গবাক্ষ, ঘুলঘুলি ও অলিন্দ-পথে আলো আসছিল।

"হেমদা—" আমি বললাম, "মনে হচ্ছে খানিকটা উঠে গেলে আলো-বাতাসের কমতি হবে না।"

"হওয়া উচিত না," হেমদা বলল। "দেখে তো মনে হয় উলটো-উলটি জানলা মাথা বরাবরই আছে।"

আমাদের গলার স্বর সামান্য অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। হয়তো এই শূন্য এবং বিশাল ইমারতের মধ্যে ঢোকার পর আমরা ক্রমশই নিজেদের অজ্ঞাতে আমাদের গলার স্বর উচ্চ করছিলাম। বদ্ধ এবং জনশূন্য বড় ঘরে যেমন শব্দ সামান্য প্রতিধ্বনিত হয়, আমাদেব কথাগুলিও আপাতত সেই রকম প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছিল।

পুষ্প বলল, "আমি সেই রাজার কথা ভাবছি, বেচারী রাজ্যের পাথর গাঁথতে গাঁথতে বুড়ো হয়ে গেল!"

"রাজপ্রাসাদে বসে থাকলেও বুড়ো হতো", হেমদা জবাব দিল।

"হলেও বা, কিন্তু এই পাথর গেঁথে সময় নষ্ট কেন!"

"আমাদের কাছে পাথর, যে করেছিল তার চোখে হয়তো পাথর ছিল না।"

হেমদার কথায় খুব আচমকা আমার কেমন যেন এক বুদ্ধিভ্রম হলো। মনে হলো, আমরা বাস্তবিক একটি প্রাচীন জরাগ্রস্ত স্তূপ অতিক্রম করছি না। রানীর কথা আমার মনে পড়লঃ আশ্চর্য সেই রাজমহিষী! রাজার সঙ্গে তিনি কি শুধু কথার খেলা খেলেছিলেন? কি অভিপ্রায় ছিল তাঁর? কেন সন্তুষ্ট হতে পারেননি? মনে মনে আমি সেই উপকথার একটি ছবি তৈরী করে নেবার চেষ্টা করছিলাম।

বাবার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁব গলার স্বর গম্ভীর শোনাচ্ছিল। বাবা মাকে বলছিলেন, "ছেলেবেলায় আমরা একটা খেলা খেলতাম। আমাদের ওখানে একটা চাঁদমারি ছিল, বড় টিলার মতন. আমরা নীচের মাঠ থেকে ছুটে এসে এক দমে সেই চাঁদমারি উঠতাম। যে আগে উঠত সেদিনকার মতন চাঁদমারিটা তার দখলে যেত। চাঁদমারি ছিল আমাদের কেল্লা আর কি!" বাবা হাসলেন।

মা'র মাথার কাপড় পড়ে গিয়েছিল, কাপড়টা তুলতে তুলতে মা হাসির গলায় বললেন, "তুমি ক'দিন কেল্লা পেতে?"

"প্রায়ই পেতাম। আমার খুব দম ছিল।" বলে বাবা থামলেন; তারপর আমাদের সকলের সামনে রহস্য করে মাকে বললেন, "আমার দমটা বড় বুকের, তুমি তো জানোই।"

দিদি বাবার একটু বেশীরকম প্রিয়। বাবার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে দিদির বাধে না। বাবার কথা শুনে দিদি হেসে বলল, "তুমি

এমন করে বলছ-না বাবা, যেন এখনো আমরা সবাই মিলে ছুটলে তুমি সবার আগে ওপরে উঠে যাবে!”

বাবা এবার জোরে জোরে হাসলেন। তাঁর হাসি যখন প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, তখন তিনি হঠাৎ বুঝি নিজের কানে সেই শব্দ শুনতে শুনতে থেমে গেলেন। তারপর ডান দিকে ফিরে চওড়া মতন জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন, “এস তবে, দেখ—। এ-পর্যন্ত আমি পৌঁছেচি, তোমাদের আগে আগেই।”

সিঁড়ি ঘুরে আমরা একে একে মিনারের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাঁধানো চত্বর, বুক সমান পাঁচিল তোলা। শীতের মধ্যাহ্ন ফুরিয়ে এল। রোদ অনেকটা যেন দোপাটি ফুলের রঙ নিয়েছে, তার তাত মরে এসেছে। এতটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে চারপাশ স্নিগ্ধ, পরিচ্ছন্ন ছবির মতন দেখাচ্ছিল। দূরে আমাদের সেই তিনটে টাঙা, ঘোড়াগুলো মাঠে চরছে, প্রান্তর এবং তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে রোদ আলস্যভরে শুয়ে আছে, শীতের বাতাস বইছিল; দূরে পাহাড়, একটি মেঘ আপন মনে ভেসে চলেছে। কয়েকটি বুনো বক শূন্যে বিচরণ করছিল।

হেমদা ঘড়ি দেখল। প্রায় সাড়ে তিনটে। পুষ্পর কাঁধে জলের বোতল। আমাব হাতে চায়ের গোল ফ্লাস্ক। হেমদার ঘাড়ে মস্ত একটা থলি ঝুলছে, তার মধ্যে পুরনো খবরের কাগজ, টর্চ, কমলালেবু, বিস্কিট, আরও কত টুকটাক।

পুষ্প জল খেল কয়েক ঢোঁক। দিদির হাতে মা'র পানের কৌটো, মা পান খেলেন। হেমদা আমাদের কমলালেবু দিল। লেবুর খোসা ছাড়িয়ে আমরা নীচে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম।

দিদি বলল, “আরো খানিকটা ওপরে উঠে চা খাব।”

আমরা ঊর্ধ্বমুখে মিনারের চূড়া দেখলাম। মাথার ওপরকার তলাগুলি ঠিক বোঝা যায় না, বাইরের বাঁধানো গোল অলিন্দে আড়াল পড়ে যায়। দিদি বললে—আরো চার; পুষ্প বলল, পাঁচ; আমার মনে হলো আরো বেশী।

বিশ্রাম শেষ হলে বাবা বললেন, "নাও, চলো। শীতের বেলা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।"

আমার মনে হলো, বাবার পক্ষে এই সিঁড়ি ওঠার পরিশ্রম হয়তো বেশী হচ্ছে। শরীর খারাপ হতে পারে। বললাম, "তুমি আরো উঠবে?"

বাবা আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে এক এক সময় আমি অত্যন্ত প্রখর এক সঙ্কল্প অনুভব করি। মনে হলো, বাবা সেই রকম দৃষ্টিতে আমায় দেখলেন। তারপর বললেন, "চলো, দেখি।"

আমরা আবার মিনার অভ্যন্তরে একে একে প্রবেশ করলাম।

আলো এবং ছায়ার মধ্য দিয়ে সোপান অতিক্রম করে আরো খানিকটা উঠে এলাম। ধুলো মাটি, পাখির গায়ের বাসী গন্ধ, জীর্ণতার ঘ্রাণ প্রায় আর ছিল না। সিঁড়িগুলি এখনো চওড়া, তবে মনে হলো ক্রমশই তার দৈর্ঘ্য কমে আসছে। বাবা সামান্য দেরি করে করে পা ফেলছিলেন। মা একবার দিদির হাত ধরে ফেলেছিলেন, ভেবেছিলেন সিঁড়িতে হোঁচট লেগেছে, আসলে মা'র পায়ে শাড়ি জড়িয়ে গিয়েছিল। সূর্য ক্রমশই হেলে যাচ্ছে বলে রোদের কেমন গোল ও চৌকোনো কিরণ মিনারের ঘুলঘুলি ও ঝরোকা পথে সোজাসুজি দেওয়ালে গিয়ে পড়ছিল। আর আমাদের কণ্ঠস্বর এখন প্রতিধ্বনিত হতে হতে নীচে এবং ওপরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। পুষ্প খেলাচ্ছলে কয়েকবার আ—আ করে ডেকেছে, এবং তার ডাক অধঃ এবং ঊর্ধ্বে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

বাবা এক সময় বললেন, "তোমাদের উচিত ছিল আরো একটু বেলাবেলি আসা।"

দিদি বলল, "আর কত বেলাবেলি আসব। দুপুরেই তো এসেছি।"

"আলো পড়ে গেলে অসুবিধে হবে।"

"আমাদের সঙ্গে টর্চ আছে।"

"তোমরা শেষপর্যন্ত উঠবে ঠিক করেছ?"

"হ্যাঁ, নয়তো আসা কেন!"

"পারবে তো?"

দিদি কিছু বলার আগেই হেমদা বলল, "এমন কিছু উঁচু নয়, না পারার কিছু নেই।"

বাবা সামান্য চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, "ওপরের দিকের সিঁড়ি কেমন তা তো জান না!"

হেমদা কোনো জবাব দিল না। যেন বাবার এই সন্দেহ সম্পর্কে কিছু বলা নিরর্থক। আমরা বুঝতে পারছিলাম, বাবা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তিনি আর বেশী উঠবেন না, ওঠা সম্ভব নয়। আরো সামান্য কিছুটা উঠতে পারলে বাবা বিশ্রামের স্থান পাবেন ভেবে আমরা কোনো উদ্বেগ বোধ করলাম না। তাঁকে বিব্রত বা ব্যস্ত না করার জন্যে আমরাও ধীর পায়ে সোপান উঠছিলাম। সকলেই নীরব তখন, আমাদের পায়ের শব্দ, বাবার ছড়ির শব্দ, স্থূল একটি আলোর বৃত্ত বাবার মাথার ওপর, বাবা সামান্য পরে সেই আলোর বাইরে চলে গেলেন, দিদি একবার ঘাড় ফিরিয়ে মাকে যেন দেখল।

এই স্তব্ধতা আমাকে কাতর করছিল। কেন জানি না, যেসব কথাগুলি এতক্ষণ আমাদের ছ' জনের মধ্যে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছিল, যেন সেই হাত আমরা ছাড়িয়ে নিয়েছি কিংবা শিথিল করেছি—এই রকম মনে হওয়ায় আমি অধৈর্য হয়ে কথা বললাম।

"হেমদা, তোমার গরম লাগছে?"

"সামান্য।"

"কোটটা খুলে ফেললে হয়।"

"চলো, ওপরে গিয়ে দেখব।"

পুষ্প ডাকল, "জামাইবাবু—"

"বলো।"

"সেই রানী এই সিঁড়ি কেমন করে উঠত?"

"তুমি যেমন করে উঠছ।"

"আমার তো হাঁটু ব্যথা করতে শুরু করে দিয়েছে।"

"তবে আর কি, থেকে যাও।"

"ইস্ রে, এত সহজে! চলুন না, শেষ পর্যন্ত কে থাকে কে যায় দেখব।"

"তাই ভাল—।" হেমদা গলার স্বর খুব নীচু করে বলল, "তুমি আগে আগে থাকলে আমি প্রেরণা পাব।"

পুষ্প যেন বলার কথা পেল না কিছুক্ষণ, তারপর মুখ ফসকে বলে ফেলল, "আর আমি কি পাব?"

ওরা কেউ এবার হাসল না।

এ-সোপান শেষ হলো। বাবা প্রশস্ত স্থানটি দিয়ে বাইরে এলেন। মা, দিদি, হেমদা, পুষ্প এবং আমিও। অনেকক্ষণ পরে আবার মুক্ত আলো-বাতাসে চোখ মেলে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। বাবা হাঁপাচ্ছিলেন, মা'র কপালে ঘামের বিন্দু। দিদি মুখ খুলে শ্বাস নিচ্ছিল। বাইরে এখনো রোদ, মোলায়েম এবং নিষ্প্রভ সেই আভায় চতুর্দিক ঈষৎ আর্দ্র দেখাচ্ছে যেন; মাঠে আমাদের অলস ঘোড়াগুলি দাঁড়িয়ে, টাঙাঅলারা কুয়ায় জল তুলছিল, অতি দূরে একটি বয়েলগাড়ি কাঠ-বোঝাই হয়ে চলেছে। শীতের হাওয়া খর হয়েছে।

হেমদা কাঁধের ঝোলা থেকে পুরনো কাগজ বের করে পুষ্পর হাতে দিল। পুষ্প কাগজ বিছিয়ে দিল নীচে। বাবা বসলেন, মা বসলেন; দিদি এবং পুষ্পও। আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। জল খাওয়া শেষ হলে চায়ের কাপ বেরুল। বাবা শুধুই চা খেলেন, মা চা এবং পান। আমরা কিছু খাবার ও চা খেলাম।

বাবাকে পরিশ্রান্ত দেখালেও বিরক্ত দেখাচ্ছিল না। তিনি যেন নিরুদ্বেগে এই-বিশ্রাম উপভোগ করছেন। তাঁর মুখে একটি অবসাদ-

মোচনের আলস্য ভাব। মিনে করা সিগারেট-কেস থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে মৃদু মৃদু ধোঁয়া টানছিলেন, কখনো আকাশ দেখছিলেন, কখনো মাকে, কখনো আমাদের।

আকাশে একটি মনোহর অলক্ত মেঘ ভেসে এসেছে, বিহঙ্গহীন শূন্যের কোথাও বুঝি অপরাহ্নের মায়া জমেছিল। আমরা একে একে পুনর্যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠলাম।

দিদি বলল, "বাবা, তুমি তাহলে এখানে বসছ!"

"হ্যাঁ, আমি আর পারব না। দিস ইজ্ মাই লিমিট্।"

পুষ্প হেসে বলল, "তুমি কিন্তু খুব একটা উঁচুতে ওঠোনি, বাবা। ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়েছে বলে এতটা লাগছে।"

বাবা পুষ্পর দিকে তাকালেন, তাকিয়ে থাকলেন স্থির চোখে, ওঁর দৃষ্টি সহসা আহত, ক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট মানুষের মতন দেখাল। বললেন, "হ্যাঁ, আমি অনেক ঘুরে ঘুরে উঠেছি।...আরো ওঠার সাধ্য আমার নেই, সাধও নেই।"

বাবার গলার স্বর সম্পূর্ণ অন্য রকম শোনাচ্ছিল, আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, বাবার চোখের তলায় অভিমানের সামান্য কালি পড়ল যেন। তিনি মা'র দিকে আস্তে করে মুখ ফেরালেন, মুখ ফিরিয়ে টেনে টেনে অন্যমনস্কভাবে পুষ্পকে বললেন, "...তোমার মা জানেন আমি কতটা ঘুরে কোথায় উঠেছি।...তা সে যাই হোক, আমি এতেই সন্তুষ্ট।"

আমরা, বাবার পুত্র কন্যা ও জামাতা, সকলেই বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বাবা আমাদের কাউকেই দেখছিলেন না, তিনি মা'র মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে ছিলেন।

৩

আমরা চারজনে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পায়ে সোপান উঠছিলাম আবার। বাবা নীচে থেকে গেছেন, মা-ও আর আসতে পারেননি।

বাবা ও মা'র কাছ থেকে চলে আসার পর আমরা আগের মতন হালকা ও স্বাভাবিক মন ফিরে পাচ্ছিলাম না। কেউই কারুর কাছে প্রকাশ করছিলাম না যে, আমরা কোথায় যেন একটি অন্যমনস্কতা নিয়ে আপাতত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যাচ্ছি, অথচ বুঝতে পারছিলাম, আমরা বাবা এবং মা'র কথা ভাবছি।

বাবার বিষয়ে দিদির দুর্বলতা সবচেয়ে বেশী। দিদি বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পাবল না। বলল, "আমার জ্ঞান হওয়া থেকে এখন পর্যন্ত আমি বাবাকে দেখছি। আমি জানি, বাবার সবটাই নিজের করা।"

আমরা কোনো সাড়া দিলাম না। দিদি কি বলতে চাইছে, আমরা জানি। আমি আমার ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাবাকে যা দেখেছি, দিদির আরো প্রায় সাত-আট বছর বেশী দেখার কথা। হয়তো দিদি বলতে চাইছে, বাবার সেই প্রায়-নিঃসম্বল অসহায় দরিদ্র অবস্থাটিও দিদি দেখেছে। আমিও আমার জ্ঞান উন্মেষের বয়সে বাবার রাজকীয় রূপ দেখিনি। সংসারে বাবা অনেক পুড়েছেন, অনেকবার মার খেয়েছেন, হয়তো পা রেখেছেন কোথাও, পরমুহূর্তে দেখেছেন অবলম্বন সরে গেছে। এ-সব আমরা কিছু জানি, কিছু বা শুনেছি। শোক, তাপ, সন্তাপের পর তবে তাঁর সাফল্য।

দিদি আবার বলল, "যে-মানুষ এক সময় টিনের ছাউনির তলায় একটা ভাঙা মেশিন আর একজন মাত্র লোক নিয়ে সারা দিনে পাঁচটা টাকার বেশী রোজগার করতে পারেনি, আজ তার লক্ষ টাকার কারখানা, নিজের বাড়ি-গাড়ি। এতটা করা মুখের কথা নয়।"

পুষ্প কেমন বিরক্ত হয়ে বলল, "অত বলার কি আছে! বাবা সুখস্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছেন জীবনে, তা পেয়েছেনও, এ আমরা জানি।"

পুষ্পর কথায় দিদি যেন অপমান বোধ করল, আহত হলো, বলল, "হ্যাঁ, আমরাও সেটা না পাচ্ছি এমন নয়। বাবা চেষ্টা করে

পেয়েছিলেন, আমরা সবাই বসে বসে পাচ্ছি। ...আর আমরা পেয়েছি বলেই তার দাম দেবার কথা ভাবছি না।"

দিদি এবং পুষ্পর কথা-কাটাকাটি হেমদা আর বাড়তে দিল না। বলল, "সকলেই এক রকম জিনিস চায় না। যার যা আশা। তোমাদের বাবা তো বলেই দিলেন, তিনি আর কিছু চান না, ওই পর্যন্ত তাঁর লিমিট।" বলে হেমদা হেসে বলল, "রেণু ঠিকই বলেছে, তোমাদের উনি এ পর্যন্ত এনে দিয়েছেন, সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তোমাদের আর ভাবতে হবে না।...এখন যা ভাবার তাই ভাব, এখনো অনেকটা উঠতে হবে—দম নষ্ট করো না।"

পুষ্প আর কিছু বলল না, দিদিও চুপ করে গেল।

আমি আমার পায়ের তলার সিঁড়ির কথা ভুলে গিয়েছিলাম প্রায়, এখন আবার মনে হলো। পা শক্ত করে এক সিঁড়ি থেকে অন্য সিঁড়িতে উঠে যেতে যেতে হঠাৎ কি মনে হওয়ায় সকলকে শুনিয়ে বললাম, "বাবা আমাদের অনেকগুলো শক্ত সিঁড়ি তুলে দিয়েছেন; নাও এখন চলো।"

হেমদা হাসল, "বেশ বলেছ অন্ত, মার্ভেলাস। ...কিন্তু একটা জিনিস তুমি দেখলে না।"

"কি জিনিস?"

"মা কেমন বাবার পাশটিতে থেকে গেলেন।"

"মা কোনোকালেই বাবার বেশী যেতে চান না। বাবাকে ছেড়েও যেতে চান না।" আমি সরল গলায় বললাম।

হেমদা হাসল, তার হাসি দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে কেঁপে কেঁপে যেন অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে নীচে তলিয়ে শেষে ডুবে গেল।

আমরা চারজনে আরো দুটি তল উঠে এলাম। দিদি হাঁপিয়ে পড়েছিল। দিদির চেহারা একটু ভারী। মাথায় কিছু লম্বা বলে দিদিকে ওই ভারী চেহারায় বেমানান দেখাত না। অনেক সময়

দিদিকে লোকে অবাঙালী বলে ভুল করেছে। দিদির মুখেও তেমন তলতলে ভাব ছিল না, একটু বোধ হয় রুক্ষ ও শক্ত দেখাত।

দিদি পুষ্পর কাছ থেকে জল চেয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল। পুষ্পও মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল। আমরা যে যথেষ্ট উঁচে উঠে এসেছি তা বোঝা যাচ্ছিল। নীচের যাবতীয় বস্তু ক্ষুদ্র দেখাচ্ছিল; আমরা দূরান্তের গ্রামটি এবং বৃক্ষলতা স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম না, সব যেন একই পটে আঁকা; উচ্চতার জন্য এখানে বাতাস অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ, শীত করে উঠল, আমরা মা ও বাবাকে দেখলাম, নিতান্ত শিশুর মতন দেখাচ্ছিল, পুষ্প ডাক দিয়ে ওঁদের ডাকল, হাত নাড়ল, বাবা-মা মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

মাঘের এই অপরাহ্ন বেলা ক্রমশই বিষণ্ণ হয়ে এসেছে, অদ্ভুত নিঃশব্দতা চতুর্দিকে, সেই অলক্ত মেঘটি কোন দূরান্তে চলে গেছে। একটি পাখির দল বনপ্রান্তর থেকে উড়ে উড়ে আসছিল। নীল আকাশতলায় মিনারের মাথাটি যেন মহিমার মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে।

হেমদা বলল, "নাও, আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, বিকেল হয়ে আসছে, আলো থাকতেই স্বর্গে উঠতে হবে।"

আমরা প্রস্তুত, দিদিই মাটিতে বসে। দিদির চোখ দুটিতে অবসাদ; মুখে ক্লান্তি ফুটে আছে। হাতের রুমালে দিদি কপাল মুছল। শীতের এই প্রচণ্ড বাতাসে তার কপালে ঘাম থাকার কথা নয়, হয়তো যে গ্লানিটুকু তার কপালে জমে আছে, অভ্যাস-বশে সে সেটুকু মোছার চেষ্টা করল। দিদি অনেকদিন হলো এইভাবে তার কপাল মোছার চেষ্টা করছে, আমি জানি।

দিদির জন্যে আমার মায়া হলো, দুঃখ হলো। বললাম, "কি দিদি, ওঠো।"

ওঠার কথায় দিদি তেমন উৎসাহ পেল না আর, তবু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

হেমদা শুধলো, "পারবে কি ?"

দিদি ক্লান্তস্বরে বলল, "দেখি। এই মাঝ-পথে একলা বসে থাকব কি করে!" দিদির বিষণ্ণ চোখ দুটি আমায় অপরাহ্নের ছায়ার কথা মনে পড়াল।

আমরা চারজনে আবার সেই বদ্ধ এবং ধূসরালোক মিনারের মধ্যে এলাম। সোপানগুলি এখন বেশ ছোট এবং খাড়া হয়ে উঠেছে। হেমদা আগে; পুষ্প, দিদি—পর পর; সবার শেষে আমি। আমরা সকলেই কম-বেশী পরিশ্রান্ত থাকায় আগের মতন দ্রুত সিঁড়ি উঠতে পারছিলাম না; এই সিঁড়ির ধাপগুলিও আরোহণের পক্ষে কষ্টসাধ্য। দিদির কথাও আমরা ভাবছিলাম, তাকে ধীরে সুস্থে উঠতে দেওয়াই ভাল। কনকনে ঠাণ্ডার একটি ভাব জমছিল এতক্ষণে।

হেমদা বলল, "অন্ত, মহাপ্রস্থানে যাবার সময় কার কি দোষে পতন হয়েছিল জানো তা ?"

"জানি বলে মনে হচ্ছে।"

"আমার মনে নেই, ভুলে গেছি।"

হেমদা কথাটা কেন বলল জানি না। আমার দিদির কথা মনে পড়ল। হেমদা কি দিদিকে ইঙ্গিত করে কিছু বলতে চাইল! এবার কি দিদির পতন হবে!

পুষ্প অকস্মাৎ কেমন ভীতরবে চেঁচিয়ে উঠল। আমরা চমকে গেলাম। পুষ্পর আতঙ্কিত স্বর আরো ভয়ানক হয়ে ফাঁপা ফাঁপা সুবিশাল এই মিনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। হেমদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে পিছু ফিরে পুষ্পকে ধরে ফেলল।

"কি হলো ?" হেমদা উদ্বিগ্ন গলায় শুধোলে।

পুষ্প কোনো কথা বলতে পারল না সামান্য সময়, তারপর ভীতস্বরে বলল, "কি একটা আমার মুখের পাশ দিয়ে ছুঁয়ে গেল।"

"দূর্‌···কি ছুঁয়ে যাবে আবার!"

"আমি বলছি গেছে, আমার গলার পাশ দিয়ে চলে গেল। হাতের মতন।"

"বাদুড় হয়তো।" আমি বললাম।

হেমদা ঝোলা থেকে টর্চ বের করে আলো ফেলল। "কই! কিছু নেই তো!"

"অন্ধকারে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে···" পুষ্প বলল।

"যাক, নাও চলো।"

আরো খানিকটা উঠে আসতেই আমরা আচমকা একটি ঘরের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। মনে হলো, সিঁড়ির বাঁকে একটি ছোট ঘর, তার দু'দিকেই উন্মুক্ত পথ। তৃতীয় পথে আমরা এসেছি। আমরা ডান দিকের পথে এলাম, সামনে নিকষ কালো অন্ধকার, বাঁ দিকের পথে গেলাম—অটুট আঁধার, যেন অন্ধকারের প্রাচীর গাঁথা আছে। হেমদা টর্চ জ্বালাল। আলোয় অল্পে অল্পে বোঝা গেল: উভয় পাশেই ক্ষুদ্রাকার ঘর, ঘরগুলির দু-পাশেই দু'টি দরজার মতন পথ। ডান দিকের ঘর ধরে এগিয়ে যেতে আবার একটি সমান আকারের একই রকম পথ-অলা ঘর চোখে পড়ল। আমরা আর বাইরের আলো পাচ্ছিলাম না।

হেমদা বলল, "অন্তু, আমার মনে হচ্ছে, একটা বড় গোল ঘরকে যেন চার-পাঁচ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ঘরে দুটো করে দরজা করা হয়েছে।"

"কেন?"

দিদি যেন কি বলতে যাচ্ছিল, পুষ্প হঠাৎ বলল, "আমার কেমন লাগছে! আমরা যেন পাতালে নেমে গিয়েছি। কী অন্ধকার!··· আমার ভয় করছে। জামাইবাবু, বাইরে চলুন।"

হেমদা কোনো জবাব দিল না, কি যেন ভাবছিল চুপ করে দাঁড়িয়ে। শেষে বলল, "আমার বিশ্বাস এই গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে কোনো একটা পথ চূড়ায় উঠে গেছে। হয়তো সামান্য আর-একটু পথ বাকি আছে আমাদের।"

"কিন্তু হঠাৎ এখানে এ-রকম বেয়াড়া ঘর করবার কারণ কি?" আমি শুধোলাম।

"কে জানে! হয়তো ওপরের কনস্ট্রাকশানের জন্যে।...আসলে অন্তু, এগুলো ঠিক ঘর নয়, পথও নয়; খিলান। খিলান বড় বেশী, তাই ধাঁধার মতন দেখাচ্ছে।"

দিদি বলল, "আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, বাইরে চলো।"

"তাহলে—" হেমদা হাসল, "এই পর্যন্ত; এত কাছাকাছি এসেও ফিবে যেতে হবে!"

আমার ফেরার ইচ্ছা ছিল না। যদি এমনই হয়, প্রায় আমরা চূড়ার কাছে পৌছে গেছি—তবে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমার বরাবর আফসোস থাকবে। আমি বললাম, "হেমদা, দিদিরা বাইরে অপেক্ষা করুক, চলো আমরা যাই।"

হেমদা বলল, "তাই ভাল।...তার আগে তো বাইরে যাই..."

আমরা বাইরে আসার জন্যে একটি একটি করে দরজা পেরোলাম, কিংবা সেই বিসদৃশ খিলানগুলি অতিক্রম করছিলাম। হেমদার হাতে টর্চ। আমরা চারজনে গায়ে গায়ে পিছু পিছু চলেছি। চলেছি, চলেছি—অথচ কী আশ্চর্য, বাইরের আলো পাচ্ছি না, পথ পাচ্ছি না। ক্রমশই দিদি ভীত হচ্ছিল, পুষ্প অধৈর্য হয়ে উঠছিল। আমারও কেমন উদ্বেগ জমছিল ক্রমশ।

দিদি বিড়বিড় করে বলল, "ছি ছি, কী ভুল করেছি!...এখানে কেন এসেছি!"

পুষ্প কাতর হয়ে বলল, "জামাইবাবু, বাইরে চলুন—আর পারছি না।"

আমরা বাইরের পথ পাচ্ছিলাম না। প্রতি বার ভাবছি, ওই খিলানের আড়াল পেরোলে বাইরের আলো আমাদের পথ দেখিয়ে ডেকে নেবে; প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম, আমরা আমাদের পথটুকু পেয়ে যাব, অথচ আমরা এই রহস্যময় গোল ঘরটির কয়েকটি অংশের

মধ্যে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। যত সময় বয়ে যাচ্ছিল আমরা পথ হারানো পথিকের মতন, গুহা মধ্যে নিক্ষিপ্ত পশুর মত ততই অধৈর্য ও হতাশ হয়ে কেমন অদ্ভুত এক শঙ্কা অনুভব করছিলাম। দিদি চিৎকার করে কি যেন বলল, তারপর নিজের সেই অদ্ভুত চিৎকারের বিচিত্র প্রতিধ্বনি স্তব্ধ হবার আগেই পাশের দরজার দিকে ছুটে গেল। দিদি ওখানে আলোর আভাস দেখে ভেবেছিল, বাইরের পথ পেয়েছে। দিদি ছুটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তার পিছু পিছু ছুটে গেলাম। বাইরের আলো দেখা দিল, অতি সামান্য; আমরা দিদির জন্যে— আলোর জন্যে মরিয়া হয়ে আলোর দিকে এগিয়ে যাবার সময় সহসা পরস্পরের কথা ভুলে গেলাম। আমরা প্রত্যেকেই পাগলের মতন আলোয় আসতে গিয়ে হুড়োহুড়ি এবং ছুটোছুটি করে কোথায় এসে পৌঁছলাম জানি না—অথচ আমি আমার পাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে সঙ্গীচ্যুত ও একাকী হয়ে গেছি অনুভব করে পাথরের মত নিষ্প্রাণ নির্জীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমার ভীত হৃৎপিণ্ড অতি দ্রুত হয়ে উঠেছিল, ধক ধক শব্দটা আমার কানে বাজছিল, যেন হৃৎপিণ্ডটি বুকের মধ্য থেকে লাফিয়ে আমার কানের কাছে চলে এসেছে। সম্পূর্ণ অন্ধকারে আমি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে।

সেই অবর্ণনীয় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে আমি হেমদাকে ডাকলাম।

আমার ডাকের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে আসার আগেই পুষ্পর ডাক শুনতে পেলাম, "অন্তুদা—"

হেমদা ডাকল, দিদি ডাকল। আমরা পরস্পর পরস্পরকে ডাকছি। গলার স্বর মাত্র আমাদের সম্বল। আমরা কেউ আর পরস্পরের পাশে নেই। আমরা সকলেই আতঙ্কিত ও আর্ত। আমরা পরস্পরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলাম।

হেমদা চেঁচিয়ে বলছিল যে, অন্ধকারে আমরা যেন পথের কাছে

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, হেমদা আলো হাতে একে একে আমাদের কাছে আসবার চেষ্টা করছে।

প্রায়-মৃত, বেহুঁশ মানুষের মতন আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। অজ্ঞাত, বীভৎস একটি দানবের মতন যেন নিঃশব্দে মৃত্যু আমার কাছে এগিয়ে আসছিল।

দিদি পাগলের মতন কাঁদছে, পুষ্প ডেকে ডেকে গলা দিয়ে বুঝি রক্ত বের করে ফেলল, হেমদা সাহস দিচ্ছে; বার বার বলছে, সে আসছে, সে আসছে। অথচ হেমদা আসছিল না।

হয়তো মানুষের কোনো আদি অনুভূতি তাকে শেষ সময়ে পশুর মতন বেপরোয়া করে তোলে; আমি সেই পাশব ও অদম্য আত্মরক্ষার প্রেরণায় মসীকৃষ্ণ অন্ধকার ও অজ্ঞাত পথ অতি সন্তর্পণে পেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়ালাম। পা টেনে টেনে দেওয়াল ধরে ধবে হাঁটছি, হাঁটছি; দিদি বমি করছে যেন, পুষ্প বাচ্চা মেয়ের মতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কখনো মনে হয়, তারা আমার কাছে চলে এসেছে, হাত বাড়ালে স্পর্শ করতে পারব; কখনো মনে হচ্ছিল ওরা অন্য কোথাও চলে গেছে, আমি এখানে একা। সম্ভবত আমারই মতন দিদি এবং পুষ্প মরিয়া হয়ে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরছিল, হেমদা সেই অদ্ভুত গোলকধাঁধার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে যথাসাধ্য করছিল। ক্রমশই আমাদের গলার স্বর বসে এল, আমরা ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে নীরব হয়ে নিস্তব্ধতা বিরাজ করলে এই স্থানটি যেন তার পরিত্যক্ত মহিমা ফিরে পেল।

কতক্ষণ পরে জানি না, সহসা আলো দেখতে পেয়ে আমি হেমদাকে ডাকলাম। হেমদা আমায় ডাকল। পুষ্প সাড়া দিল, দিদির কথা ভেসে এল। আমরা কে যে কোথা থেকে বেরিয়ে ছুটে আলোর সামনে আসছিলাম জানি না, পাগলের মতন ছুটে আসতে গিয়ে পুষ্প হেমদার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ঠক্ করে শব্দ হলো; হেমদার হাতের টর্চ মাটিতে পড়ে গেছে। আবার অন্ধকার।

হেমদার মুখ থেকে আর্ত শব্দ হলো ঃ যাঃ—!

মাটিতে বসে হাতড়ে হাতড়ে হেমদা টর্চ কুড়িয়ে ঝাঁকাল, হাতের তালুতে ঠুকল, নাড়ল-চাড়ল, তারপর আতঙ্কের স্বরে বলল, "বালব্ ভেঙে গেছে।"

টর্চের আলোটুকুতে আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছিল ; আমি অনুভব করলাম—আমার এই হাত পা মাথা মুখ দৃষ্টি—এমনকি আমার হৃৎপিণ্ডও—আমার যা আছে—কিছু না, কিছুই নয়, ওই বাইরের আলোটুকুই আমার জীবন। সেই আলো নিবে গেলে আমি মৃত্যুভয়ে শিহরিত হলাম।

তারপর কি ঘটছিল আমি সুস্থ চেতনায় কিছুই অনুভব করতে পারছিলাম না। কখনো হারিয়ে যাচ্ছিলাম, কখনো আমার পাশে কাউকে অনুভব করছিলাম। পুনরায় সেই নিষ্ফল চেষ্টা, ব্যর্থ উদ্যম, বারংবার পরস্পরকে আহ্বান। অন্ধকারের মধ্যে আমি একটি নাগর-দোলায় চড়ে আছি যেন, নাগরদোলাটি ঘুরছে, কখনো আমায় ওপরে তুলছে, কখনো আবার নীচে ফেলে দিচ্ছে। অবশেষে আমার মনে হলো, আমি যেন একটি ঘুরন্ত খোপ-কাটা জালি ঘরের মধ্যে একটি খোপে বন্দী, সমস্ত কক্ষটি—প্রতিটি খোপ ঘুরছে ক্রমাগত এবং আমি পাশের খোপে যেতে গিয়েও পারছি না, কখনো দিদি আমার কাছে এসে পড়ছে, তাকে হাত ধরে টেনে নেবার আগেই সে চলে যাচ্ছে ; কখনো হেমদা, কখনো পুষ্পকে আমি ছুঁতে গিয়েও ছুঁতে পারছি না।

এক সময় হেমদা আর দিদিকে আমার কাছাকাছি কোথাও অনুভব করলাম। দিদি প্রলাপের মতন কথা বলছে।—"আমি জানি, তুমি ইচ্ছে করে আমার দিকে আসছ না ; আমি তোমার হাত ধরতে পেয়ে যদি বেঁচে যাই, তাই তুমি হাত গুটিয়ে আছ।"

"আমি তোমায় খুঁজে পাচ্ছি না, রেণু।"

"ও তো পুরনো কথা।...তুমি কি খোঁজ, কাকে খোঁজ, আমি জানি।"

"তুমিও তো খুঁজছিলে।"

"পাইনি। আমার কপাল।"

"তবে আর কি! যার যা কপাল···"

দিদির গলা আর উঠল না, হয়তো সে মুখ বুজে কাঁদছিল।

দিদিকে এ-সময় আমি কিছু বলতে চাইছিলাম। তাকে খোঁজার জন্যে হাতড়ে হাতড়ে কোথায় এলাম জানি না। "দিদি—"

দিদির সাড়া নেই। কয়েকবার ডাকলাম, "দিদি—দিদি।" দিদি সেখানে ছিল না। সে কোথায় থেকে গেল জানি না।

দীর্ঘসময় পরে আমি আবার দু'টি মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

"অত ভয় পাচ্ছ কেন, আমার হাত ধরার চেষ্টা কর—চেষ্টা কর।"

"যাব কোথায়?" পুষ্পর গলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

"কোথাও যাব," হেমদা বলল।

"কোথায় আর যেতে পারছি!"

"পারব।···আমরা বেরোবার পথ খুঁজছি, একবার যদি পথ পাই···"

"আমি আর স্বর্গে যেতে চাই না।"

"পুষ্প, তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছ; অত ভয় কেন! ···আর একটু কাছে এস, আমি তোমায় কোথাও নিয়ে যাব, কোথাও···"

আমি হেমদাকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারলাম না, আমার গলা বন্ধ হয়ে এল।

৪

রাত্রে ঘুমের মধ্যে পথ হাঁটলে যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির কোনো অনুভব থাকে না, আমারও কোনো চেতনা ছিল না, আমি অচেতনায় হাঁটতে হাঁটতে, হাতড়াতে হাতড়াতে, পা ফেলে ফেলে কোথায় এসে পৌঁছলাম জানি না, অকস্মাৎ আমার চোখে শেষ অপরাহ্ণের আলো

লাগল। বিশ্বাস হলো না, আমি আলোয় এসেছি; মনে হলো: এ আমার মতিভ্রম। চোখ পরিষ্কার করে তাকালাম, আলো নিবল না। আমি আমার গা হাত পা লক্ষ করলাম, পোশাক নজর করে দেখলাম। অবশেষে আমি বাইরে আসতে পেরেছি। সহসা জীবনের বাসনাগুলি আমায় আন্দোলিত করল, সাহস এল, স্বস্তি ফিরে পেলাম। চারপাশের ঘেরা ঘুলঘুলি দিয়ে তাকিয়ে গোধূলির ম্রিয়মাণ আলো, ছায়াময় দূরান্ত বনানীর একটি অংশ যেন আমার চোখে পড়ল। সন্ধ্যাসমাগমে শীতের বাতাস অসহ্য হয়ে উঠেছে।

কিছু সময় আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার কোনো অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আমায় বলছিল, আমার মাথার ওপরে মিনারের শেষ চূড়া, চূড়ার মাথায় গোধূলির স্বর্ণচ্ছটা এখনো মুছে যায়নি। ওখানে কায়ক্লেশে ওঠার এখনো সময় আছে। আরো কয়েকটি দণ্ড।

কোন এক দুর্বোধ আবেগ এবং আশঙ্কা আমায় অস্থির করে তুলছিল। এ সুযোগ কে হারায়! অনেক কষ্টের পর, অনেক ভ্রম এবং বহু অনিশ্চিত সোপান পেরিয়ে আমি এখানে এসেছি। নিতান্ত সৌভাগ্যবশে। এখান থেকে ফিরে যাওয়া মূর্খতা।

বাবার কথা আমার মনে পড়ল, তিনি এক জায়গায় উঠে এসে বসে আছেন। মা'র মুখ আমার চোখের সামনে ভাসল, মা বাবার পাশে পাশেই আছেন, যেন জীবনে মা সঙ্গদান ভিন্ন অন্য কিছুর আশা করেননি। দিদি অনেক আগে থেকেই ক্লান্ত, তবু সে মাঝপথে থাকতে ভয় পেয়ে হেমদার কাছাকাছি উঠে আসতে চেয়েছিল, পারেনি। দিদি তার কপাল মুছতে পারল না। প্রথম যৌবনের গ্লানি তার কপালে লেগে আছে। দিদি মর্যাদার মোহে এবং আত্মরক্ষার্থে যেখান পর্যন্ত এসেছিল, সেখানে এসে থেমে গেছে, হেমদা তাকে খুঁজে পায় না। পুষ্প স্বর্গ চায় না, সে কি চায় জানে না, সে নিজের শঙ্কিত বাসনার অবসান চায় হয়তো, হয়তো সে চতুর প্রতিদ্বন্দ্বীর মতন

চরম জয় চায়। আমি জানি না সে কি চায়। হেমদা অতি গোপনে তার জীবনের কোনো নিষ্ফল বাসনা পূর্ণ করতে চায় বুঝি, সে শুধু পথ খুঁজছে।

নিজেকে নিঃসঙ্গতম মানুষ অনুভব করার পর যে বেদনা হওয়া সম্ভব, আমি এখন সেই বেদনা অনুভব করছিলাম। আমি সকলকে পরিত্যাগ করেছি, সকলের সহযাত্রী হয়ে যাত্রা শুরু করে অবশেষে একাকী এখানে এসেছি। আমি চেষ্টা করব শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে যেতে।

খুব সন্তর্পণে আমি গোধূলির আলোটুকুতে একটি পথের আশায় চতুর্দিক লক্ষ করতে লাগলাম। সুউচ্চ প্রাচীর এবং সামান্য মাত্র ঘুলঘুলির জন্যে কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। অনুমানে আমি পথ হাতড়াচ্ছিলাম।

সেই রাজ্যত্যাগী বৃদ্ধ রাজার কাহিনী আমার মনে পড়ল, যিনি খঞ্জ এবং অক্ষম হয়েও চেষ্টা করেছিলেন স্বর্গারোহণ করার। তিনি কি পেরেছিলেন শীর্ষে পৌঁছোতে? আমার ত্রিপাঠীবাবুর কাহিনীও মনে পড়ল। সেই রানী প্রকৃতই কী চেয়েছিলেন! কোন অসামান্য তৃপ্তি? কতটা উচ্চতায় এসে তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন? নাকি রাজা দেখেছিলেন, রানীকে তৃপ্ত করা অসাধ্য, তাই সাধ্যমত চেষ্টার পর রানীকে আর ফিরতে দেননি?

গোধূলির আলো ক্রমশই ম্লান হয়ে আসছিল। আমার বুক অবসিত আলোর দিকে তাকিয়ে ক্রমশই দ্রুত ও ভয়ানক হয়ে উঠছিল। আর সামান্য পরে আলো মুছে যাবে, আমি শীর্ষদেশে উঠতে পারব না।

কে যেন আমায় বলছিল: তাড়াতাড়ি করো, সময় ফুরিয়ে এল। আশ্চর্য এক আবেগ আমায় উত্তেজিত ও আকুল করছিল। আমি পাগলের মতন সামান্য মাত্র পথ খুঁজছিলাম, কোনো রকমে যেখান দিয়ে চলে যেতে পাবব। আমার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, আর কয়েকটি সোপান শেষেই শীর্ষ চূড়া। সেখানে পৌঁছতে পারলে

আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হবে। যে গোধূলিটুকু এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছে, সেই শেষ আলোয় আমি জ্ঞানে-অজ্ঞানে, বেদনায় ব্যাকুলতায়, দুঃখে হতাশায় ও আঘাতে যা খুঁজেছি হয়তো তা দেখতে পাব।

অব্যক্ত কোনো যন্ত্রণায় এবং ভয়-তাড়িত ব্যাকুলতায় বার বার উন্মত্তের মতন, ভিক্ষুকের মতন, শিশুর মিনতির মতন, যুবকের প্রেমকামনার মতন এবং বৃদ্ধের ভগবত প্রার্থনার মতন আমার পথটুকু আমি খুঁজে ফিরলাম।

হয়তো আমি কোনো প্রচণ্ড আক্রোশে এবং বিক্ষত যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, সহসা গোধূলির অন্তিম আলোটুকু আমার চোখে মরে গেল।

অন্ধকারে আর কিছু দেখা গেল না, আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।
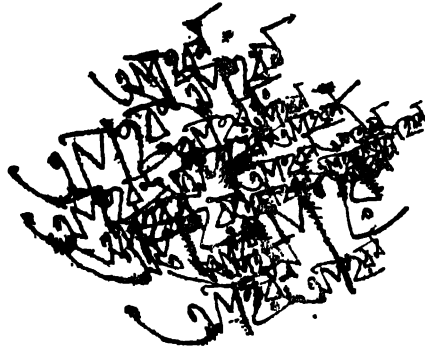
অপহরণ / আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

মাত্র কয়েকদিন আগে উমাপ্রসাদ দত্ত-র মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। তিনি কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নন; তাঁর কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। আমি যতদূর জানি, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও উমাপ্রসাদের কিছু নেই। তবু খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছাপা হবার কারণ, অস্বাভাবিক এক অবস্থার মধ্যে ওঁর মৃত্যু। উমাপ্রসাদ রাত্রের ট্রেনে হাজারিবাগ রোড স্টেশন থেকে গয়া যাচ্ছিলেন। জায়গার অসুবিধের জন্যে তিনি তাঁর টিকিট বদলে নেন। ফার্স্ট ক্লাস কামরায় তাঁর সহযাত্রী ছিল এক অবাঙ্গালী দম্পতি। কোডারমা স্টেশনের কাছে চেন-টানা গাড়ি থামলে উমাপ্রসাদের কামরার সেই অবাঙ্গালী ভদ্রলোকের ভীত, সন্ত্রস্ত, প্রায়-উন্মত্ত চেহারা এবং তাঁর চেঁচামেচি ও কান্নাকাটিতে রেলের লোকজন ও পুলিস কামরায় ঢুকে দেখে—উমাপ্রসাদ নিহত, অবাঙ্গালী মহিলাটি সামান্য আহত ও মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে আছেন।

খবরের কাগজে এই মৃত্যুটিকে 'শোচনীয় ও নৃশংস' বলে উল্লেখ

করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই যে তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য, উমাপ্রসাদ যদি এই ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থায় মারা না যেতেন খবরের কাগজে তাঁর উল্লেখ থাকত না। প্রকাশিত সংবাদের বিবরণে বলা হয়েছে, অর্থ ও অলঙ্কারের লোভে জনৈক দুর্বৃত্ত কামরায় প্রবেশ করেছিল। যখন সে কামরার মহিলাটিকে আক্রমণ করে, তখন মহিলার স্বামী ভয়ে দিশেহারা হয়ে নিজেদের প্রাণভিক্ষা করছিলেন; তিনি স্ত্রীর অলঙ্কার ও অর্থ দুর্বৃত্তের হাতে তুলে দিতেও চেয়েছিলেন; উমাপ্রসাদ কিন্তু আততায়ীকে বাধা দিতে যান; এবং অস্ত্রাহত হন। ভদ্রলোকের জবানবন্দী অনুসারে আততায়ী কোডারমা স্টেশনে গাড়ি পৌঁছবার আগেই পালিয়ে গেছে।

কাগজে সম্পূর্ণ ঘটনাটির রোমহর্ষক বিবরণ ও নৃশংসতার পরিচয় যত্ন করে তুলে ধরা হয়েছে; উমাপ্রসাদের দুঃসাহসের উল্লেখে তেমন কোনো যত্ন অবশ্য আমি খুঁজে পাইনি। এর জন্যে কাগজকে দোষারোপ করি না, কেননা নিশীথরাত্রে চলন্ত ট্রেনে ভয়ংকর রাহাজানি, খুন, মূর্ছিত মহিলা ইত্যাদি একটা ঘটনা, উমাপ্রসাদ ব্যক্তিগতভাবে কোনো ঘটনা নন, ঘটনার নিমিত্তমাত্র।

উমাপ্রসাদকে আমি চিনতাম, তাঁর ব্যক্তিগত রূপটিও আমার পরিচিত। তিনি সম্পর্কে আমার আত্মীয়। গত বছর পূজার সময় আমি তাঁকে শেষ দেখেছি। আমার ধারণা, উমাপ্রসাদ এই মৃত্যুর দ্বারা তাঁর নিজের এবং তাঁর আঁকা ছবিগুলো কিছুটা সম্পূর্ণ করেছেন। সম্ভবত এবার যদি ছুটিতে হাজারিবাগে যাই, উমামামার ছবি আঁকার ঘরে ঢুকে আমি তাঁর শেষ বয়সের আঁকা 'অপহরণ' সিরিজের ছবিগুলিতে এই সম্পূর্ণতা অনুভব করতে পারব।

উমামামা ছবি আঁকতেন। ছবি আঁকিয়েদের লোকে শিল্পী বলে। উমামামাকে শিল্পী বলতে আমার কুণ্ঠা হয়। তিনি নিজেও কখনো বলতেন না, তিনি শিল্পী; বলতেন: চুপচাপ বসে থাকি সারাদিন, ওই একটা শখ, ছবি আঁকার চেষ্টা করি। উমাপ্রসাদ যদি শিল্পী

হতেন, বাঙ্গালা দেশের মতন শিল্পীর দেশে লোকে তাঁর নাম শুনত বই কি! *আমি প্রায় নিঃসন্দেহ, উমাপ্রসাদের নাম আজ পঞ্চাশ* বছরের মধ্যে কেউ কোথাও শোনেনি; ঘরেও নয়, বাইরেও নয়। কাগজে উমাপ্রসাদের যে মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়েছে—তার কোথাও আপনারা উমামামার শিল্পী-পরিচয় পাবেন না।

উমামামার সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক ছিল, যোগাযোগ ছিল না। উনি আমার মা'র দূর সম্পর্কের ভাই। বছর পাঁচেক আগে আমরা একবার সপরিবারে শীতের সময় হাজারিবাগে বেড়াতে যাই। মা শুনেছিলেন, এখানে তাঁর এক আত্মীয় বহুকাল ধরে আছেন। খোঁজ-খবর করতে উমামামাকে আবিষ্কার করা গেল।

পাঁচ বছর আগে উমামামাকে যখন প্রথম দেখি, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। মাথায় বেশ লম্বা, ছিপছিপে শক্ত চেহারা। তাঁর শারীরিক গড়নের মধ্যে পুরুষোচিত দীর্ঘতা ও সবলতার ভাব ছিল। গায়ের রঙটি ছিল কালো। মুখের ছবিটি মনে রাখার মতন: লম্বা ছাঁদের মুখ, শক্ত চোয়াল, দীর্ঘ উঁচু নাক, সরু পাতলা চিবুক। চোখ দুটি তেমন উজ্জ্বল ছিল না, মোটা কাচের চশমার আড়ালে তাঁর দৃষ্টি সব সময়ই কেমন দুর্বল দেখাত। উনি চোখের অসুখে কিছুকাল যাবৎ ভুগছিলেন। উমামামার মাথার চুলগুলি আর কালো ছিল না, সাদা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ঠোঁট সবসময় ফাঁক হয়ে থাকত, এবং লক্ষ করলে বোঝা যেত তাঁর মুখের মধ্যে কিছু আছে। তিনি মুখের মধ্যে হরিতকীর কুচি রাখতেন।

কথাবার্তায় উমামামা সদালাপী, একটু জোরে জোরে কথা বলতেন এই যা, গলার স্বরটি ছিল ভরাট। দোষের মধ্যে, উনি এক সময় হয়তো অনর্গল কথা বলে গেলেন কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেলেন। কিছুতেই আর মুখে একটি কথা ফুটনো যেত না। আমরা প্রথম প্রথম ভাবতাম, কোনো কারণে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, স্বভাবতই আমরা অস্বস্তি বোধ করতাম। পরে বুঝতে পারলাম,

এইটেই ওঁর স্বভাব। হয়তো হাঁপানির অসুখের জন্যে খানিকক্ষণ একটানা কথা বলার পর তিনি ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে ওঠেন। কিংবা সাবধান হবার কথা মনে পড়ে যায়।

উমামামার বাড়িটা ছিল একেবারে একপ্রান্তে, তারপর আর লোকালয় ছিল না। বাড়ির পরই জঙ্গলের ঢালু জমি, একটা খালের মতন নদী, নদীর ওপর রেলের সাঁকো। ওঁদের বাড়িটা অনেককালের পুরনো, ভাঙা পাঁচিলে ঘেরা মস্ত চৌহদ্দি, অসংখ্য গাছপালা; প্রায় যেন জঙ্গল। বাড়িতে উমামামার আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ ছিল না। বাড়ির একপাশে দু-তিনটি দেহাতী স্কুল-পড়ুয়া ছেলে থাকত; কুয়াতলার দিকে তারের ভাঙা জালের মধ্যে কিছু বুনো পাখি খুশিমতন আসত যেত, এক সময় ওখানে তিনি ময়ূর থাকার ঘর করেছিলেন। কয়েকটি দিশী কুকুর সপরিবারে উমামামার বাড়িতে বসবাস করত।

বাড়িটা দেখে প্রথম দিন আমার তেমন ভাল লাগেনি। হাওয়া-বদলের শহরে ছিমছাম, সুন্দর, সুদৃশ্য বাড়ি কিছু কম ছিল না; সে-সবের তুলনায় উমামামার সেই শুকনো লেবুর মতন রঙ-ধরা জীর্ণ বাড়ি, চতুর্দিকে গাছপালার অরণ্য, কুকুর বেড়ালের সর্বত্র বিচরণ আমার দৃষ্টিকটু লেগেছিল।

পরিচয়ের পর উমামামাকে আমার বড় পছন্দ হয়েছিল। মা'র কথা বলতেই সামান্য সময় যেন পুরনো স্মৃতি হাতড়ালেন, তারপরই চিনে ফেললেন: "রমার ছেলে তুমি!···আরে, আরে, তাহলে তো তুমি আমার ভাগ্নে। এসো, চলে এসো।···রমা এখানে এসেছে! আমায় একটা চিঠি দিল না কেন?···কোন বাড়ি নিয়েছ? 'শুকতারা'? না বাড়িটা ভালই; তবে অযথা ভাড়া নিলে। আমার এখানে উঠলে তোমাদের অসুবিধে হতো না। ক'জন তোমরা?"

ঘরে এনে বসিয়ে উমামামা চাকরটিকে হাঁক দিলেন, "চা তৈরী কর; বাবুকে আণ্ডা তৈরী করে দে।"

তারপর উমামামা পুরনো প্রসঙ্গে চলে এলেন। "নাইনটিন নাইনে অক্টোবরে আমার জন্ম, আর রমার—মানে তোমার মা'র—নো—সে জন্মেছিল নাইনটিন নাইনের ডিসেম্বরে। তিন মাসের ছোট-বড়। সাত-আট বছর বয়স পর্যন্ত আমরা ধরো একই বাড়িতে মানুষ। তারপর বাবা মুন্সেফ হয়ে নর্থ বেঙ্গলে চলে গেলেন, আমরাও চললাম।"

উমামামার ভরাট গলায় যতখানি আত্মীয়তা ও অন্তরঙ্গতা ছিল ঠিক ততখানি স্নেহ। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা উমামামার ভক্ত হয়ে উঠলাম।

মা উমামামাকে নাম ধরে ডাকত, উমামামা মাকে বলত, বুড়ি। মা'র ওটাই ডাক-নাম। আমার বাবা করপোরেশনের চাকুরে ছিলেন; মারা গেছেন কয়েক বছর আগে, মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়ে গিয়েছিলেন বরানগরে। উমামামা মাকে বলতেন, "বুড়ি, এখানে থাক না ক'টা মাস। তোর তো সব সাবালক ছেলেমেয়ে।" মা বলতেন, "তোমার জঙ্গলে আমার মন টিকবে কেন। এখন ক'টা লোক আছে, এরা চলে গেলে শুনেছি সব ফাঁকা। আর তোমার বাড়ি তো ভূতের বাড়ি করে রেখেছ।"...কথা শুনে উমামামা জোরে জোরে হাসতেন।

শীত কাটিয়ে ফেরার কথা, বউদির অসুখের জন্যে সেবারে আমাদের মাসখানেক পরেই ফিরতে হলো।

উমামামা আমায় বললেন, "তোর তো কলেজের চাকরি চঞ্চল, তাও ছাত্র পড়াস না, ল্যাবরেটরী গুছোস। থেকে যা এই জানুয়ারী মাসটা।"

বললাম, "এবারে না মামা, পরে আবার আসব।"

"মিথ্যে কথা বলছিস কেন?...তোরা কলকাতা শহরের আজকালকার ছেলে, এই ঝোপজঙ্গল গাছপালা অন্ধকার তোদের ভাল লাগে না। তুই কি আর সহজে আসবি, চঞ্চল!"

"আমি প্রমিস করছি আসব।"

"কেন আসবি ?"

কেন আসব সেকথা আমি বলতে পারিনি, অনুভব করেছিলাম শুধু। উমামামার মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতেও আমার লজ্জা হচ্ছিল। মুখ ফিরিয়ে অনেকক্ষণ পরে শুধু বললাম, "তোমার এই জায়গাটা বেশ। আমার ভাল লাগে খুব।"

উমামামা আমার মুখ দেখছিলেন। এক সময় বললেন, "আচ্ছা, দেখা যাক···"

তারপর গত পাঁচ বছরে আমি বার তিনেক উমামামার কাছে গিয়েছি। তাঁর কাছেই উঠতাম। কখনো পূজার আগে, কখনো পূজার পর ওঁর কাছে গিয়ে হাজির হতাম, পনেরো-বিশ দিন থাকতাম, ফিরে আসার আগে পায়ের ধুলো নিতে গেলেই উমামামা বেশ বিচলিত হয়ে উঠতেন।

"আবার সেই আসছে বছর—।"

"দেখি, শীতের সময় যদি পারি !"

"শীত ভাল ; তবে একবার বর্ষার সময় আয়। এমন বর্ষা চোখে দেখিসনি তুই। একেবারে কালিদাসের সেই 'পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ'··· ।"

"আমি সংস্কৃত জানি না, মামা।" হেসে বলি।

"আচ্ছা, আচ্ছা, বাংলা কালিদাসই পড়ে শোনাব তোকে।···ওই নে ঘন্টি পড়ল তোর গাড়ির।"

প্লাটফর্মে যাত্রীদের চাঞ্চল্য লক্ষ করতে করতে বললাম, "মামা, এবারে এসে তোমার ছবি শেষ হয়েছে দেখব তো ?"

উমামামা আমার দিকে দু-মুহূর্ত তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

বললাম, "কতবার আর একই জিনিস আঁকবে !···একদিন তো শেষ করতে হবে তোমায়।"

উমামামা অস্পষ্ট করে অন্যমনস্কতার মধ্যে শব্দ করলেন।

এরপর গত পূজায় ওঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। উমামামা চিঠি লিখতে অনভ্যস্থ ছিলেন। কদাচিৎ আমার চিঠির জবাব দিতেন। তাঁর শেষ চিঠি পেয়েছিলাম গত এপ্রিল মাসে। আজ আগস্ট মাসে তিনি আর ইহলোকে নেই।

উমামামার মৃত্যুসংবাদ শুনে মা মর্মাহত হয়ে বলল, "নিয়তি। মরণ টানছিল। নয়তো যাবার কথা সেকেণ্ড ক্লাসে, টিকিট বদলে অন্য কামরায় আসে!"

দাদা বলল, "কোনো মানে হয় না। বুড়ো মানুষ, কি দরকার ছিল তাঁর এগিয়ে যাবার। যাদের যাচ্ছিল তারা তো প্রাণের মায়া করে সব দিতেই যাচ্ছিল—ওঁর এইরকম হঠকারিতা করতে যাওয়া কেন!"

ছোট বোন মায়া বলল, "দেখ আবার, যে লোকটা সাধু সাজছে তারই কোনো হাত আছে কি না। অচেনা মানুষ সম্বন্ধে কিচ্ছু বলা যায় না, বাবা।"

মা যা বলেছে : নিয়তি ; দাদা যা বলেছে : বুড়ো মানুষের হঠকারিতা ; এবং মায়ার যা ধারণা—আমি তার কোনোটাকেই অস্বীকার করতে চাই না, আবার স্বীকার করতেও রাজী না।

উমামামার এই মৃত্যু আমার কানে কানে যেন বলছে : "চঞ্চল, আমি আমার ছবি শেষ করেছি।"

উমামামার চরিত্রের যেদিকটা সামাজিক এবং পারিবারিক, আত্মীয়-স্বজনের মত তার আভাস আমি দিয়েছি, কিন্তু তাঁর জীবনের অন্য কোনো কথা আমি বলিনি। আমার সঙ্গে তাঁর এমন একটি ঘনিষ্ঠতা হয়ে এসেছিল, যা ঠিক পারিবারিক আত্মীয়তার নয়, অন্য কিছুর। স্পষ্ট করে এই সম্পর্কের কথা বোঝানো আমার সাধ্য নয়। খুব গোপনে, কখনো কোনো হতাশায়, কখনো আবেগবশত, চেতনায় এবং অবচেতনে আমি যা অন্বেষণ করি, উমামামা আমায় তার ইঙ্গিত

দিতে পারতেন। তাঁর এবং আমার মধ্যে অনুভবের একটি যোগসূত্র রচিত হয়েছিল, হয়তো বা আত্মিক এবং আন্তরিক। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম বস্তুত এই কারণে; উমামামার প্রতি আমার আকর্ষণ ও মমতার হেতুও তাই। তিনিও আমার কাছে তাঁর মন অনেকখানি খুলে দিতে পেরেছিলেন, অনেক অনুভবের কথা বলতে চেষ্টা করতেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ প্রায় সখ্যের রূপ নিয়েছিল, বন্ধুর মতন আমরা অনেক সময় কথাবার্তা বলতাম, তিনি কখনো কখনো বয়সের পার্থক্য ভুলে গিয়ে আমায় তাঁর সমবয়স্ক করে তুলতেন।

উমামামার একটি জীবন ছিল, যাকে আমরা বাস্তবের জীবন বলি। মা'র কাছে কিছু, খানিক বা উমামামার মুখে আমি সেই জীবনের কথা শুনেছি।

উমামামার বাবা ছিলেন সেকেলে মুন্সেফ, পরে সাবজজ হয়েছিলেন। রাসভারী, কড়া মেজাজের মানুষ। উনি পরিবারের মেজ ছেলে; বড় ছেলে ছিল প্রায় বাবার মতন। উমামামার মা ছিলেন শান্তশিষ্ট ধর্মভীরু প্রকৃতির। উমামামার বাবাকে চাকরিতে প্রায়ই বদলি হতে হতো। ছেলেদের শিক্ষার ব্যাপারে সেটা নিতান্ত ব্যাঘাত মনে হওয়ায় তিনি উভয় ছেলেকেই স্থায়ী ভাবে রাজসাহীতে রেখে দেন, মামার বাড়িতে। যথাসময়ে উমামামা কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে স্বদেশী হুজুগে মেতে কলেজ ছেড়ে দেন। তারপর হুজুগ কাটলে বেনারসে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যান। যে বছর তিনি পাস করলেন, সে বছরে দাদার মৃত্যু ঘটল। শোকাহত জনক-জননী সান্ত্বনার আশায় গয়া কাশী হরিদ্বার করে বেড়ালেন, মন প্রবোধ মানল না। শেষে লোকালয়বর্জিত এই হাজারিবাগ জায়গাটিতে কেমন করে মন পড়ে গেল। উমামামার বাবা জায়গা-জমি কিনে বসবাস শুরু করলেন এখানে। জপতপে মন দিলেন মা। বাবাও শেষ বয়সে ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

উমামামা কিছুকাল চাকরিবাকরি করার চেষ্টা করেছেন, কোথাও

মন বসাতে পারেননি। বাবার মৃত্যুর পর এখানেই স্থায়ীভাবে থেকে গেলেন; বাবার গচ্ছিত অর্থ ও এখানের জমিজমাতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ভালই ছিল। জঙ্গলের দেশ ছেড়ে তিনি আর নড়লেন না।

তারপর মা মারা গেলেন।

কৌতূহলবশত আমি আমার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "উমামামা বিয়ে করেননি?"

আমার মা উমামামার বাল্যকালের কথা ছাড়া আর কিছু প্রায় জানতেন না, সুতরাং বিয়ের কথাটাও তাঁর জানার কথা নয়। আত্মীয়স্বজনের মুখে শোনা কথা যা জেনেছিলেন, তাতে বিবাহ প্রসঙ্গ ছিল না। ফলে তিনি উমামামাকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি বরাবর বাউণ্ডুলে হয়ে থাকলে! বিয়ে-থা করলে না কেন?"

জবাবে উমামামা হেসে বলেছিলেন, "করেছিলাম, কপালে টিকল না।"

আমরা ধরে নিয়েছিলাম, উমামামার স্ত্রীও মৃত।

পরে আমার সঙ্গে উমামামার সম্পর্ক গভীর হলে আমি অন্য কিছুও জানতে পারি।

উমামামার সাধারণ পরিচয় শেষ হলো। এবার তাঁর অন্য পরিচয়।

উমামামার সেই শুকনো লেবুর মতন রঙ-ধরা বাড়ি, সেই প্রাচীনতা ও জীর্ণতা, গাছপালার জঙ্গল এবং কুকুর বেড়ালের আবাস-স্থলটি আমার প্রথম দিন ভাল না লাগলেও প্রথম পরিচয়ের পর তিনি যখন আমায় সেই বিরাট চৌহদ্দির পিছন দিকের একটি জায়গায় নিয়ে গেলেন, আমি যেন অরণ্যের মধ্যে একটি নির্জন স্তব্ধ পরিচ্ছন্ন দেবমন্দির দেখে বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম।

কদমগাছের আড়ালে একটি 'কটেজ' মতন, সামনে সবুজ ঘাসের প্রাঙ্গণ, চারপাশে তারের জাল দেওয়া বেড়া বেয়ে দেশী লতার ফুল

ফুটে আছে, ছোট ছোট সবুজ পাতার রাশ; মাধবীলতার গুচ্ছ ঝুলছে শীর্ষে। একদিকে কয়েকটি গোলাপ চারা, অন্যদিকে একজোড়া শিউলি গাছ। কাঠের ছোট্ট ফটক খুলে পা বাড়ালে সিঁড়ি, সিঁড়ির গায়ে অপরাজিতার ঝোপ।

সিঁড়ি উঠে সরু বারান্দা, বারান্দার ওপর উমামামার খরগোস-থাকা বাক্স, গাছের ডাল কেটে একটা পাখি-বসা দাঁড়, একপাশে জলচৌকির ওপর মাটির এক শিবমূর্তি। একটা ডেক-চেয়ার পাতা ছিল বারান্দায়।

বারান্দার বাঁ দিক ঘেঁষে একটা ঘর, পিছনে আরো একটা; পিছনের ফালি মতন বারান্দার সঙ্গে এক চিলতে জায়গা মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

বাড়িটার গাঁথুনি ইটের, মাথার ওপর খাপরার ছাউনি, তলায় চুণকাম করা চটের সিলিং।

দু'টি ঘরের একটিতে বসে উমামামা ছবি আঁকার কাজ করেন, খুব খোলামেলা; অন্য ঘরটিতে কিছু ছবি, কিছু পুরনো বইপত্র, মাটি এবং কাঠের কিছু শিল্পকর্ম, তামার নৃসিংহমূর্তি, পেতলের মস্ত এক প্রদীপ পড়ে আছে, আর একপাশে সরু মতন একটি তক্তপোশ, বিছানা-পাতা।

উমামামার দ্বিতীয় পরিচয়টুকু জেনে আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, "আপনার স্টুডিয়ো?"

উনি বললেন, "না, আমি এখানে বসে একটু কাজকর্ম করার চেষ্টা করি, বিশ্রাম নিই।"

"আপনি আর্টিস্ট?"

"কে বলল! আমি শখ করে মাঝে মাঝে ছবি আঁকার চেষ্টা করি। এসব কিছু না। চলো, তোমায় আমার বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং দেখাই।"

উমামামা আমার কথাটা গায়ে মাখলেন না।

প্রাথমিক এই পরিচয় ক'দিনেই কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। মানুষটি আমায় কৌতূহলী ও আকৃষ্ট করে তুলেছিল ; আচার, আচরণ, স্বভাব, এমনকি তাঁর জীবনযাপনও আমার কাছে অন্য রকম লাগত। উনি যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন তা সহজেই বোঝা যেত, কিন্তু এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে যে তিনি কাতর অথবা পীড়িত হচ্ছেন তা অনুমান করা যেত না। বরং আমার মনে হতো, উমামামা নির্জনে এক ধরনের সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেছেন যেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন, বাড়িতে অনেকগুলি মুরগী দেখে আমি তাঁকে আমিষভোজী ভেবেছিলাম ; আসলে মুরগীগুলি, তাঁর গৃহে আপন স্বভাবে বিচরণ করত এবং উমামামার চাকর ও দেহাতী ছাত্রগুলি তাতে লাভবান হতো। ওঁর কোনো রকম নেশাও ছিল না, চা অবশ্য খেতেন, সিগারেট পান ইত্যাদি খেতে দেখিনি। আমি তাঁকে কখনো পূজাটুজা করতে দেখতাম না। কিন্তু তিনি যে ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করতেন তা আমি দেখেছি, শুনেছি। উমামামার পুরনো বইয়ের মধ্যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীও ছিল। তবে, আমার ধারণা, উমামামা রামায়ণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আমার সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় হয় তখন তিনি রামায়ণ থেকে একটি বিষয় বেছে নিয়ে কয়েকটি ছবি আকার কাজে হাত দিয়েছেন। বিষয়টি সীতাহরণের। তিনি আমায় নাম দিতে বলায় আমি ছবিগুলির নাম দিয়েছিলাম 'অপহরণ' সিরিজ।

ছবি দেখায় আমি অভ্যস্ত নই। উমামামার ছবি অন্যের চোখে কেমন মনে হবে তা আমি জানি না, জানার ইচ্ছাও নেই। হয়তো উমামামা খুবই নিপুণ ও দক্ষ হাতে কাজ করতে পারতেন, হয়তো বা তাঁর হাত ভাল ছিল না, রঙের জ্ঞান ছিল না, অন্যান্য শিক্ষাও ছিল না। তাঁর আঁকা ছবির শিল্পমূল্য সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি একটি বিষয়ে মাত্র নিঃসন্দিগ্ধ, উমামামার ছবি তাঁর আত্মানুসন্ধান।

উমামামার জীবনে কতকগুলি প্রশ্ন ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর পাঁচ বছরের ঘনিষ্ঠতায় আমি ওঁর কয়েকটি প্রশ্ন জেনেছি।

ওঁর সমস্ত প্রশ্নের মূল হয়ে শেষাবধি একটি প্রশ্নই দেখা দিয়েছিল—মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি কি ?

উমামামা শেষের দিকে রামায়ণের সীতাহরণ অবলম্বন করে যে কয়েকটি ছবি আঁকার কাজে হাত্ দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই প্রশ্নটি ছিল।

তিনি পর পর এই ক'টি ছবি এঁকেছিলেন: পর্ণশালায় সজল নয়নে সীতা বসে আছেন। কুটির সংলগ্নে ছদ্মবেশী রাবণ: পরিধানে কাষায় বস্ত্র, মস্তকে শিখা, স্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু। দূরে গোদাবরী; চার পাশে বৃক্ষ। রাবণ সীতাকে লোভার্ত ও কামার্ত চোখে যেন স্তুতি করছে: বিশালং জঘনং পীনমূরু করিকরোপমৌ…ইত্যাদি। অর্থাৎ সীতার বিশাল ও স্থূল নিতম্ব, হাতীর শুঁড়ের মতন উরুদ্বয়, বর্তুল, দৃঢ় পীনোন্নত স্তনযুগল—যা তাল ফলের মতন সুন্দর তা দেখে রাবণ বিমোহিত।

দ্বিতীয় ছবিটি, স্বমূর্তি প্রকাশ করে কুপিত রাবণ দাঁড়িয়ে আছে। তার বিরাট দেহ, দশ মুখ, কুড়িটি হাত, নীল মেঘের ন্যায় বর্ণ, পরিধানে রক্তবাস।

তৃতীয় ছবিটি সীতাহরণের। রাবণ সীতার কেশ ধরে আকর্ষণ করে রথে উঠছে।

চতুর্থ ছবিটি জটায়ুর। বৃক্ষের ওপর বৃদ্ধ জটায়ু নিদ্রিত। সীতার বিলাপ তাঁর কানে আসছে।

পঞ্চম এবং শেষ ছবি: রাবণের সঙ্গে বৃদ্ধ জটায়ুর সংগ্রাম।

উমামামার সীতাহরণ সিরিজের ছবিগুলিতে আমি প্রথমে কোনো বিষয়বৈভব পাইনি। শতবার এই ছবি আঁকা হয়েছে। নতুন কিছু ছিল না।

একদিন উমামামাকে বললাম, "তুমি কি রবি বর্মা ?"

উমামামা হেসে মাথা নাড়লেন। "না। কেন বলছিস বুঝতে পারছি।"

পরে একদিন তাঁকে বলেছি, "ওই এক ছবি আজ দু'বছর ধরে কি এত আঁকছ!"

"আঁকছি কোথায়, পারছি না।..."

"তাই দেখছি। তোমার একই ছবি বছরে বছরে পালটে যায়। সীতা খানিকটা পালটেছে। রাবণ আরো পালটে গেছে।"

"হ্যাঁ, যখন মনে হয় ঠিক হয়নি তখন আরো শুধরে নেবার চেষ্টা করি।"

"পারফেক্ট হবার চেষ্টা কর!"

"তা বলতে পারিস।"

"বেশী পারফেক্ট হবার চেষ্টা করার একটা বিপদ আছে মামা। একটা গল্প পড়েছিলাম, গল্পের সেই বিখ্যাত বুড়ো আর্টিস্টের অবস্থা হবে।...সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

উমামামা বললেন, "সমস্ত সাধনাই এক সময় মানুষকে অন্ধ করে।..." বলে উমামামা চুপ করে গেলেন, অনেকক্ষণ পরে উদাসীন গলায় বললেন হঠাৎ, "যাক গে, আমি তো আর্টিস্ট নই। আমার ভাবনাগুলোই বড় অসম্পূর্ণ।"

পরের বছর উমামামার সঙ্গে যখন দেখা হলো, দেখলাম, তাঁর চারটে ছবি শেষ হয়েছে ; শেষ ছবিটি নিয়েই তিনি বিব্রত ও অশান্ত হয়ে আছেন। রাবণের সঙ্গে জটায়ুর সংগ্রাম আবার নতুন করে আঁকছেন।

সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমা। উমামামার সঙ্গে স্টেশন ঘুরে বারোয়ারী তলায় গিয়েছিলাম। লক্ষ্মী প্রতিমা দেখে ফিরছি, একটি মস্ত ঝকঝকে গাড়ি এসে বারোয়ারীতলায় থামল। বৃহৎ একটি পরিবার নেমে এল গাড়ি থেকে ; বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বধূ, ছেলেমেয়ে। উমামামা দেখলেন সামান্য, তারপর পা বাড়ালেন।

রাস্তা দিয়ে আমরা পাশাপাশি হাঁটছি। অতি মনোহর জ্যোৎস্না। সমস্ত পথপ্রান্তর বৃক্ষলতা যেন পূর্ণিমার সাগরে ডুবে আছে। কার্তিক মাসের সামান্য হিম পড়ছিল। আকাশটি যেন রুপোর জলে টলমল করছে, মাথার ওপর পূর্ণচন্দ্র। রাস্তায় কুচি পাথরগুলি কিরণে চিকচিক করছিল। ঘাস মাটি এবং শস্যক্ষেত্রগুলি নিস্তব্ধ, যেন কোনো অলৌকিক মোহে অভিভূত হয়ে আছে।

সাঁকোর পর মেঠো পথ, উমামামার বাড়ি। সাঁকো পেরিয়ে এসে উমামামা বললেন, "ওই গাড়িটা দেখেছিলি ?"

"কোনটা ? যেটা এসে থামল ! পেল্লায় গাড়ি।"

"হ্যাঁ। সিঙ্গী মশাইদের গাড়ি। প্রচুর ধনী লোক। পাটনায় থাকেন সব।"

"তোমার চেনা ?"

"না, আমি এদের কাউকে চিনি না। একজনকে চিনতাম, সে আসেনি।" বলে উমামামা হাতের ছড়ি দিয়ে পথের ওপর পড়ে থাকা একটা শুকনো ডাল সরিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন। আমরা নির্জন ও নিস্তব্ধ মাঠ দিয়ে হাঁটছিলাম।···কিছুক্ষণ নীরবে হেঁটে এসে উমামামা প্রায় আপনমনে কথা বলার মতন করে বললেন, "খুব সম্ভব পেস্তা রঙের শাড়ি পরা সুন্দরী যে মেয়েটিকে দেখলি, সে ওরই মেয়ে।"

"কার ?"

"আমি যাকে চিনতাম।"

উমামামা যে মেয়েটির কথা বললেন, আমি যেন তাকে চিনতে পারলাম। খুবই সুন্দরী, কিন্তু আমার ধারণা হলো, তিনি বিবাহিতা এবং যুবতী। উমামামার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, "তুমি মেয়ে বলছ কেন, বউ বলো। বছর পঁচিশ বয়স তো হবেই।"

"তা হবে।" উমামামা অন্যমনস্ক।

ফিরে এসে আমরা উমামামার সেই ছবির বাড়িতে গিয়ে বসলাম।

চায়ের সাধ হয়েছিল, চাকরে চা দিয়ে গেল। বারান্দায় একটি ডেক-চেয়ারে উমামামা, অন্য বেতের হেলানো চেয়ারটিতে আমি। আমাদের চোখের সামনে অবিরল জ্যোৎস্নার বৃষ্টি পড়ছে যেন।

চা খেতে খেতে আমি শুধোলাম, "তুমি যেন কি ভাবছ, উমামামা!···ছবির কথা?"

উমামামা সাড়া দিলেন না। ধ্যানীর মতন বসে থাকলেন। এই ধরনের মুহূর্তগুলি আমি সহ্য করতে পারি না, অধৈর্য হয়ে উঠি। তবু চুপ করে থাকলাম।

শেষে এক সময় উমামামা বললেন, "আমার ছবিগুলো কেমন লেগেছে তোর তা তো বললি না?"

"সীতা হরণ··· ! ভালই লেগেছে।···আমি তো ছবির কিছু বুঝি না।"

"সীতা বুঝিস তো!"

"বারে, রাম সীতা বুঝব না?"

উমামামা জবাব দিলেন না কথার। নীরবে বসে থাকলাম। আমার মনে হলো, আমি উমামামাকে তাঁর ছবি সম্পর্কে ভাল মতন কিছু বললাম না, এবং আমার জবাব যথেষ্ট হয়নি। বস্তুত, এই ছবি নিয়ে—না, আঁকা নিয়ে নয়, বিষয় নিয়ে—উমামামার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে তর্ক হয়েছে। আমি বুঝতে পারতাম না, তিনি কেন সীতার শারীরিক লক্ষণগুলির প্রতি নজর দেন। উমামামা অবশ্য আমায় বাল্মীকি রামায়ণের শ্লোক উদ্ধার করে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, সীতার ওই সৌন্দর্য স্বয়ং মহাকবির বর্ণনীয় ছিল। আমার অভ্যস্ত চোখ সীতাকে যেন তপস্বিনীরূপে দেখতে চাইত।

কথাটা মনে এল; বললাম, "তোমার সীতাকে দেখলে আগেই আমার চোখ জ্বালা করত, এবার আরও ভীষণ করছে।"

উমামামা আমার কথা নিশ্চয় বুঝলেন, "জানিস, রাবণ সীতাকে

বলেছিল ঃ আমি বহু স্থান থেকে বহু উত্তম স্ত্রী সংগ্রহ করেছি ; কিন্তু তোমাকে দেখে আমার তাদের ওপর আর অনুরাগ নেই ।”

হয়তো উমামামা আমায় ইঙ্গিতে সীতার সৌন্দর্যের দাহের কথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন । আমার বলার কথা খুঁজে পেলাম না । শেষে বললাম, “তোমার রাবণ— ?”

“আমার রাবণ কি— ?” উমামামা শুধোলেন ।

“তাকে আরো ভয়ংকর মনে হয় । ···কি জানি বুঝি না ঠিক । ···ওই যে যেখানে সীতার সামনে স্বমূর্তি প্রকাশ করে দাঁড়িয়ে আছে—ওই ছবিটায় তোমার রাবণকে দেখলে আমার কেমন ভয় করে ।”

“দশটা মাথার জন্যে ? না কুড়িটা হাতের জন্যে ?”

“ঠাট্টা করছ ! ···তোমার রাবণ কিন্তু রাক্ষসেরও বেশী । চরম পিশাচ । ···দম্ভ, লোভ, কাম, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা—সব দিক দিয়েই আদি শয়তানের মতন । ···কি করে তোমার মতন মানুষ এই রাবণ আঁকতে পারল ভেবে আমি অবাক হই ।”

উমামামা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন আমার মনের খুব গভীরের কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, “রাবণের এই চেহারা তুই দেখতে পাস না ?”

“না ।”

“এখন তোর অল্প বয়স, আরো বয়স হোক—এই সংসারকে দেখতে শেখ···”

“এর পর তো তুমি বাল্মীকির কথা বলবে । তাঁর রাবণের বর্ণনা শোনাবে ।”

“না, আমি বাল্মীকির কথা বলব না, চঞ্চল ; নিজের কথা বলব ।”

কথায় কথায় আমি কিছু উত্তেজিত হয়েছিলাম, উমামামার কথায় তাঁর দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালাম ।

উমামামা মৃদু ও অন্যমনস্ক গলায় থেমে থেমে বললেন, “আমার

স্ত্রী খুবই সুন্দরী ছিল। লোকে বলত আগুনের মতন রূপ। তার সেই রূপেব আকর্ষণে এক রাবণ এসেছিল।”

আমার বুকের কোথাও যেন একটি ভীত স্পন্দন এসেছিল; সেই স্পন্দন ক্রমশই দ্রুত হচ্ছিল, এবং আমায় যেন আন্দোলিত করছিল। সচকিতে উমামামার দিকে তাকিয়ে আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছিল। তিনি স্থির ও শান্ত। জ্যোৎস্নার কিরণ আমাদের ধৌত করছিল। অদ্ভুত একটি ঝিল্লিরবে সব যেন পূর্ণ হয়ে উঠেছে। উমামামার খরগোসের বাক্স শূন্য, তবু যেন জ্যোৎস্নার আলোয় সেই মৃত জীবটিকে অলৌকিকভাবে আমি অনুভব করছি।

“আমি তখন মুঙ্গেরে”, উমামামা বললেন, “চাকরি করি। টুরে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি, তাকে কে চুরি করে নিয়ে চলে গেছে।”

আমার আপাদমস্তক কম্পিত হলো। অথচ কী নির্বিকার নিরাসক্ত চিত্তে উমামামা এই ভীষণ ঘটনার কথা বললেন, যেন সেই স্মৃতিতে তিনি আর বিচলিত নন, ব্যথিত নন। আমি অপলকে তাঁর মুখপানে তাকিয়ে থাকলাম।

“অসম্মান, অগৌরব, লজ্জা আমায় তখন খুবই পীড়িত করেছিল—”, তিনি বললেন, যেন আমার স্বাভাবিক বিস্মিত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, “কিন্তু আমি চোরের অনুসন্ধান করিনি।”

স্তব্ধ ও আহত হয়ে এই মানুষটির অদ্ভুত সেই আচরণের কারণ বোঝাবার চেষ্টা করলাম। “কেন? তুমি খোঁজ করার চেষ্টা করলে না কেন?”

“তাতে কোনো ফল হতো না। আমার মনে হয়েছিল, আমি তাকে ধরে রাখতে পারব না।”

“তুমি কি বলছ, উমামামা!···লোকটাকে তুমি চিনতে না?”

“পরে চিনেছি···”

“তবু তুমি এত বড় লজ্জা মুখ বুজে সয়ে গেলে!” উমামামার প্রতি আমার ঘৃণা ও ক্রোধ হচ্ছিল।

উমামামা কয়েক মুহূর্ত যেন আমার সেই উত্তেজনা লক্ষ করলেন ; বললেন, "চঞ্চল, সংসারে আমাদের লজ্জা পাবার মতন ঘটনা অহরহ ঘটছে ; আমরা কি তা মুখ বুজে সহ্য করে যাই না!··· আমার স্ত্রীকে অন্য লোকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ায় আমি নিশ্চয় গৌরব বোধ করিনি। আমার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল। আমার তখনকার মনের অবস্থা আজ বোঝানো যাবে না।" উনি থামলেন, যেন আমায় বুঝতে দিলেন, তিনি সে সময় স্বাভাবিক মানুষের মতনই পীড়িত হয়েছিলেন। তারপর কেমন অদ্ভুত স্বরে বললেন, "···কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখেছিলাম, জীবনে অনেক কিছুর বিরুদ্ধেই তো আমি দাঁড়াতে পারিনি।"

"তুমি কার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাও?"

"আমার যাতে লজ্জা তার সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই কি আমার উচিত নয়!···একটু আগে তুই বলছিলি আমার রাবণ সাধারণ রাক্ষসের চেয়েও বেশী, সে চরম পিশাচ। দম্ভ, লোভ, কাম, ক্রোধ, নির্মমতার প্রতিমূর্তি, শয়তান ··"

"আমার চোখে তাই মনে হয়েছে।"

"তোর চোখ আর একটু পরিষ্কার হলে বোধ হয় দেখতে পাবি, যে সংসারে আমরা বেঁচে আছি তার মধ্যেও এই বিশাল রাক্ষসটি আছে। দশানন সেই অরি কখনো আমার মধ্যে, কখনো বাইরে।"

আমার মধ্যে কোথাও বুঝি একটি গোপন দ্বার সহসা খুলে গেল, অবরুদ্ধ কক্ষটির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আমার বোধবুদ্ধি নিঃসাড় হয়ে থাকল ; তারপর সেই কক্ষের অন্ধকার ঘুচে গেলে, দশানন সেই অরিটিকে যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

উমামামা বলছিলেন, "যে লোকটি আমার স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল সে কামোন্মত্ত, হয়তো রূপোন্মত্ত ; আমার স্ত্রীও যে নিজের রূপের আগুনে অন্যকে দগ্ধ করছিলেন না—তা-ই বা আমি জোর করে

বলি কি করে ? এ ধরনের ঘটনা আমাদের সংসারে অনেক ঘটেছে, অনেক ঘটবে। আমিও ঘটাতে পারতুম।”

“আমরা কি এরই মধ্যে বেঁচে আছি!” অব্যক্ত এক বেদনায় আমার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

“আমরা এরই মধ্যে বেঁচে আছি বহুকাল ধরে, এরই মধ্যে বেঁচে থাকব।”

উমামামার এই স্থির নিশ্চিত বিশ্বাস আমায় বড় শূন্য দুর্বল করে দিল। যেন আমি তাঁর কথা অবিশ্বাস করে আমার এই চেনা সংসারের দিকে তাকালাম সান্ত্বনার আশায়। দেখলাম, আমার মধ্যে ভয়, অসহায়তা, ব্যর্থতা, অক্ষমতার গভীর খাদ তৈরী হয়ে আছে; দেখলাম—এই জীবনে আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, আত্মপরতার ক্রীতদাস; তারপর আমি সেই অবর্ণনীয় দশানন রাবণকে লক্ষ করলাম, যার দশটা ভয়াবহ মাথা এবং কুড়িটি অস্ত্রধৃত হাত আমাকে হনন করছে। মহাভয় সেই পিশাচ তার স্বার্থপরতা, লোভ, আত্মতুষ্টি, প্রতাপ ও প্রভুত্বের লিপ্সার জন্য আমায় ক্ষতবিক্ষত করছে।

উমামামা স্বগতোক্তির মতন বলছিলেন, “চঞ্চল, কবি বাল্মীকি রামকে ঐশী ক্ষমতা দিয়েছিলেন; আমি রাম নই। মানুষকে হারতে হয়। জীবনের অর্থই বেদনা। দুঃখ বই আমাদের গতি নেই। যন্ত্রণা ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কোথায়! আমাদের প্রেমে দুঃখ, সাধনায় দুঃখ, প্রার্থনায় ব্যর্থতা। আমার বাবা জীবনে কিছু পাননি, দাদা মৃত্যুর কাছে বঞ্চিত হয়েছে, মা তার ঠাকুরের কাছে, আমি মানুষের কাছে···। আমি স্বীকার করে নিয়েছি, মানুষের নিয়তিই এই, শেষ অবধি কোথাও না কোথাও পরাজয়।”

“তোমার কোথাও লজ্জা নেই, উমামামা ?”

“আগে ছিল না। চোখের সামনে দেখতাম লজ্জা পাবার মতন ঘটনা অহরহ ঘটছে, আমি লজ্জিত হই না।···আমার মনুষ্যত্ব চুরি

যাচ্ছিল, আমি অসহায়ের মতন তা চুরি যেতে দিচ্ছিলাম।…শেষে আমার মনে হলো, আমি কেন বেঁচে আছি, কি অর্থ বেঁচে থাকার? অনেক দিন থেকেই কথাটা আমি ভাবছি, এখনো ভাবি।"

উমামামা যেন অনেক দূর থেকে রাত্রের পাহারাদারের মতন আমায় সজাগ থাকতে হাঁক দিচ্ছিলেন, আমি তাঁর সেই ডাক শুনতে শুনতে কোনো অতীন্দ্রিয় অনুভবে সহসা আমার মধ্যে জেগে ওঠার আবেগ অনুভব করলাম, আমার চেতনা জাগ্রত হলো। পরক্ষণেই আমি এই সংসারের দশানন রাবণটিকে যেন দেখতে পেলাম, সে আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, সে ক্রমশই বিরাট ও ভয়ঙ্কর হচ্ছিল, তার দর্পিত চক্ষু, অমিত পরাক্রম, নির্মম ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলি, এবং আমার প্রতি পরম অবজ্ঞা লক্ষ করে আমি ভীতার্ত ও অসহায় হয়ে আমার কি যেন মূল্যবান সম্পদ গোপন করার চেষ্টা করলাম। সে অতি অক্লেশে আমার সেই সম্পদ হরণ করার জন্যে হাত বাড়াল।

অস্ফুট স্বরে উমামামাকে আমি সাহায্যের জন্যে ডাকলাম।

সংবিৎ ফিরে পেতে শুনলাম, উমামামা বলছেন, "আজকাল আমার মনে হয় মানুষের জীবনে পরাজয়টা সত্য, বেদনা তার সহচর, তবু আমাদের বেঁচে থাকার একটা সঙ্গত কারণ আছে। এই সাময়িক জীবনকে আমরা সম্মানের জীবন করতে পারি, আমাদের পরাজয় সম্মানের ও অংহকারের হতে পারে।"

"সে কেমন জীবন, উমামামা?"

"আমি ঠিক জানি না।…জানার চেষ্টা করছি।…তুই দেখছিস না, আমি রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধটা কত রকম ভাবে আঁকার চেষ্টা করছি।"

উমামামার জটায়ু-ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি নানাভাবে এই ছবিটি আঁকতে দেখেছি উমামামাকে। কখনো তাঁর জটায়ু বৃদ্ধের সমস্ত শৈথিল্য নিয়ে লড়ছে, কখনো সে যৌবনের

মধ্যে ফিরে এসে লড়ছে, কখনো তার সংগ্রাম নিরাসক্ত নির্লিপ্ত প্রাণহীন, কখনো মনে হয়েছে পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের আদর্শ ও আবেগ নিয়ে সে যুদ্ধ করছে।"

"তোমার জটায়ু কোন মূর্তিতে যুদ্ধ করবে, উমামামা?" অস্ফুট গলায় শুধোলাম। যেন এই প্রশ্নটি আমার।

"নানাভাবে তাঁকে এঁকেছি। হয় তার সব মূর্তিই এক, আলাদা আলাদা ভঙ্গী; না হয় তার মূর্তি আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবে আমার মনে হয়, জটায়ু তার নিয়তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে শুধুমাত্র জীবনের সম্মান ও অহংকারের জন্যে যুদ্ধ করছে···হয়তো সেটাই ভাল।"

উমামামার সঙ্গে সেই আমার শেষ সাক্ষাৎ। তারপর এ-বছরে তিনি গয়া যাবার পথে ট্রেনে আততায়ী কর্তৃক নিহত হয়েছেন। তিনি বৃদ্ধ ও অক্ষম হয়ে এসেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এসেছিল। এ বয়সে, শূন্য হাতে, শেষ দৃষ্টিটুকু সম্বল করে তিনি কার বিরুদ্ধে এবং কিসের বিরুদ্ধে বাধা দিতে গিয়েছিলেন তা আমি জানি। নিছক অর্থ অপহরণকারী এক তস্করের বিরুদ্ধে বাধা দিতে গিয়ে তিনি নিহত হয়েছেন এ কথা স্বীকার করলে আমার পক্ষে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। তিনি তাঁর জটায়ু ছবিটি এতদিনে শেষ করেছেন বলেই আমি মনে করি।

বন্ধুর জন্য ভূমিকা / আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

আমার বন্ধু স্বর্গত বসুধা মুখোপাধ্যায় অখ্যাত ও অজ্ঞাত লেখক। প্রায় বিশ-বাইশ বছর আগে তার একটি বই আমরা তিন বন্ধু মিলে বের করেছিলাম। বসুধা তখন আমাদের মধ্যে ছিল। সেই বই যথারীতি গোয়াবাগানের এক ছাপাখানায় দীর্ঘদিন পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে। ফুটপাথে দু-পাঁচখানা বই আমরা দু-চার আনায় বেচতে পেরেছিলাম, সে-বই কেউ কিনেছেন বা পড়েছেন এমন আশা আমি করি না।

বসুধার সেই বই এতকাল পরে আবার নতুন করে ছাপা হচ্ছে। ছাপছে ভুবন, আমার এবং বসুধার বন্ধু। প্রথমবারের ছাপার সময়েও সে ছিল।

'নরক হইতে যাত্রা'—এই নামেই প্রথমবার বইটি বেরিয়েছিল, এবারেও সেই নামটি রাখা হলো; পুরনো বইটিতে ছিল তিনটি গল্প, এবারে আরো দুটি যোগ হয়েছে। বসুধা মারা গিয়েছিল এমন এক হাসপাতালে, যেখানে যাওয়া বা তার শেষ কোনো লেখা (যদি

সে লিখে থাকে) সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আমরা আমাদের জানা লেখা থেকেই তার বইটি প্রকাশ করছি।

পাঠকদের কাছে আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই মার্জনা ভিক্ষা করা উচিত। আমি লেখক নই, ভূমিকা কেমন করে লিখতে হয় জানি না। আমার ভাষাও ভূমিকার উপযোগী নয়। ভুবনই আমায় এই দায়িত্ব দিয়েছে। সে মনে করে, যৌবনে যখন বসুধার সঙ্গে আমিও লেখাটেখার চেষ্টা করেছি তখন কাজটা আমারই করা উচিত। ভুবন আরো মনে করে, বসুধার কথা আমি তার চেয়েও বেশী জানি। কথাটা হয়তো ঠিক না। কলম না ধরলেও ভুবন আমার চেয়ে বসুধার কম অনুরাগী, গুণমুগ্ধ ও ঘনিষ্ঠ ছিল না; তবু বসুধার বইয়ের ভূমিকা আমাকেই লিখতে হচ্ছে।

দীর্ঘ বিশ-বাইশ বছর পরে বসুধার মতন অখ্যাত অজ্ঞাত লেখকের অপঠিত বিস্মৃত একটি বই আবার কেন ছাপচি তার একটা কৈফিয়ত থাকা দরকার। বন্ধুত্ব ভিন্ন এর কোনো কৈফিয়ত থাকতে পারে না অবশ্য, মৃত বন্ধুর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে ব্যক্তিগতভাবে আমরা কিছু সান্ত্বনা পাচ্ছি।···দ্বিতীয় কারণ কিছুটা অন্য রকম। মাস চার-পাঁচ আগে ভুবন একবার কাশী গিয়েছিল। কাশীতে রামাপুরায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়। ভদ্রলোক বৃদ্ধ। একদিন তাঁর বসার ঘরে বসে গল্প করছে ভুবন, এমন সময় একটি ছেলে এসে একটা বাঁধানো ছবি দিয়ে গেল। কয়েক দিন আগে ঘরের ঝুল ঝাড়বার সময় দেওয়াল থেকে পড়ে গিয়ে ছবিটির কাঁচ ভাঙে, আবার সেটি বাঁধিয়ে বাড়িতে এল। স্বভাবতই ছবিটি ভুবনের চোখে পড়েছিল। ধূসর বিবর্ণ ছবির মধ্যে ভুবন বসুধাকে দেখতে পেল। তিনটি মুখের একটি বসুধা, অন্য দুটির একজন বৃদ্ধ নিজে, অন্যজন তাঁর মেয়ে। ভুবন বলল, 'একে আমি চিনি; আমার বন্ধু বসুধা।' বলে সে বসুধার অন্য পরিচয় দিল, 'ও লেখক ছিল।' বৃদ্ধ বললেন, 'আমার মেয়েও বলত, ও নাকি লেখে। আমি কখনো দেখিনি লিখতে।

তবে হরিদ্বারে গিয়ে সেবার ওকে এক ক্ষয়-রুগীর সেবা করতে দেখেছি। এই ছবিটা হরিদ্বারের। ছেলেটা যেন সন্ন্যাসীর মতন ছিল।...তুমি ওর খবর জান?'...ভুবন কি ভেবে যেন বসুধার মৃত্যু-সংবাদ দেয়নি, বলেছিল, 'না, আমি জানি না।'

কাশী থেকে ফিরে এসে ভুবনের কেন যেন খেয়াল চাপল, বসুধার সেই বই ও ছাপবে। আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি—কেন ছাপবে, কি হবে ছেপে? সে শুধু মাথা নেড়ে নেড়ে বলেছে, 'না, ছাপব। ছাপা আমাদের উচিত। বসুধাকে আমি আগে কতবার বলতাম, আমার যদি পয়সা থাকত, তার বই আমি ছাপতাম। আমার অবস্থা এখন ভাল, আমি তার বইয়ের জন্যে টাকা খরচা করতে রাজী।'

আমার মনে হয়, ভুবন আজ প্রায় ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ বছর বয়সেও তেমনি আবেগপ্রবণ উৎসাহী রয়েছে, আমি যা থাকতে পারিনি। আমার একমাত্র সান্ত্বনা, বসুধার জন্যে আমি এই ভূমিকাটুকু লিখতে পারছি। পাঠক নিজগুণে আমার অক্ষমতা মার্জনা করবেন।

বসুধার জন্ম বাংলা দেশে, পশ্চিমবঙ্গে। প্রথম যুদ্ধ থামার বছরে, উনিশ শো আঠারোতে তার জন্ম; বোধহয় অগ্রহায়ণ মাসে। তার বাবা ছিলেন পোস্ট-মাস্টার। বদলির চাকরি বলে বসুধারা হাজার ঘাটের জল খেয়েছে। বাংলা আর বিহারের মধ্যেই অবশ্য। বসুধার মা ছিলেন নম্রস্বভাব, শান্ত, ধর্মভীরু। ওর এক দিদি ছিল, বসুধা যখন কলেজে পড়ছে তখন তার দিদি স্বামীগৃহে মারা যান। বসুধার অন্যান্য কোনো আত্মীয়স্বজনের কথা আমরা জানি না।

কলকাতায় কলেজে পড়তে এল যখন বসুধা, তখন আমাদের সঙ্গে আলাপ। সে ভাল ছাত্র ছিল না, তার চেহারা সুন্দর ছিল না, এমন কি তার গলার স্বরও ভাঙা ছিল। বন্ধু হিসেবে বসুধা ছিল দুর্লভ। সে যত না পড়ত তার দশগুণ আপনমনে নানা কথা ভাবত, যখন

আমাদের কিছু বলত বা বোঝাত, তার ভাঙা ভাঙা গলার স্বর আবেগে কেমন যেন অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠত। বসুধার চোখ বলত, সে একটু বেশী রকম আবেগপ্রবণ। তার মুখের গড়ন ছিল লম্বা, থুতনি সরু, নাক বেশ পাতলা আর উঁচু; কিন্তু চোখ দুটি ছিল সামান্য যেন ছোট, খুব ঝকঝকে, মোটা মোটা ভুরু। ওর রঙ ছিল আধ-ফরসা, মাথাব চুল কোঁকড়ানো। চেহারার মধ্যে তার এমন কিছু ছিল না যা অন্যকে আকর্ষণ করবে, সাধারণ বাঙালী ছেলেব থেকে ওকে আলাদা করার কথাও নয়। কিন্তু আমরা, যারা বসুধার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম, তারাই শুধু জানতাম ওব স্বভাবের ছাঁচটা আমাদের মতন নয়, কোথায় যেন একটা আকর্ষণ রয়েছে।

বি. এ. ক্লাসে পড়ার সময় বসুধা লেখার চর্চা শুরু করে। তার আগেও হয়তো লিখত, কিন্তু আমরা তার খবর জানতাম না। বসুধার প্রথম লেখা গল্প আমাদের বন্ধুদের এক কাগজে বেবিয়েছিল। সেই কাগজ বা সেই গল্প হারিয়ে গেছে। তখন কলকাতায় বোমা পড়ার সময়, নানা দিকে ডামাডোল, মানুষ ভয়ে আতঙ্কে ছুটছে, পালাচ্ছে। ওই রকম অস্থিরতার সময় সবাই যা লিখছিল, বসুধাও সেই রকম এক গল্প লিখেছিল। একেবারে মামুলি লেখা। তখন অবশ্য আমরা তার খুব প্রশংসা করেছি, কিন্তু বলতে কি, সেই গল্প এত মামুলি যে, আজ আমার কিছু মনে নেই গল্পটা সম্বন্ধে।

আমার বিশ্বাস, বসুধাও মনে করত, তার ঠিক-ঠিক নিজের লেখা শুরু হয়েছিল তেতাল্লিশ সাল থেকে। তখন আমরা সবাই চাকুরে, বসুধা চাকরি করত সিভিল সাপ্লাইয়ে; আমি আর ভুবন অন্যত্র। বউবাজাবের এক মেসে থাকত বসুধা, বন্ধুবান্ধব বলতে আমরা দু'জন, মেসের ঘরে বিকেলের পর সন্ধ্যে থেকে আমাদের আড্ডা জমত, বসুধা তার লেখার কথা বলত, কিছু যদি লিখে রাখত আমাদের পড়ে শোনাত। তার মন বড় অস্থির ছিল, কখনো পুরো করে কিছু লিখত না, একটা কিছু আজ লিখব বলল, কাল আর লিখল না; অনেক

লেখা শুরু করেছে, সামান্য লিখে ছেড়ে দিয়েছে। মাসের পর মাস সে শুধু লেখার কথা বলেছে, কিন্তু এক বর্ণও লেখেনি।

এই বইয়ের যেটি প্রথম গল্প, 'বিনোদিনীর দুঃখ'—তখনকার দিনের একটি মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। গল্পটিতে বসুধার প্রথম যেন নিজের কোনো বলার কথা ধরা গিয়েছে। তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল বিনোদিনীর, স্বামীর বয়স তখন আঠারো। লালপেড়ে মোটা শাড়ি গায়ে থাকত না বলে বিনোদিনী পুঁটলির মতন করে অর্ধেকটা শাড়ি পিঠে করে বয়ে বেড়াত, তার স্বামী গঙ্গাপদ বউয়ের জন্যে স্টীমারঘাটের হাট থেকে মাটির পুতুল, কাঁচের চুড়ি, কাঁচপোকার টিপ, চিনে সিঁদুর, কাঁচা পেয়ারা, জাম কিনে আনত লুকিয়ে লুকিয়ে, এনে বউকে দিত, রাত্রে তক্তপোশের তলা থেকে লুকোনো জিনিস বের করে বিনোদিনী খেলতে বসত, কিংবা রাত্রেই কাঁচা পেয়ারাটা চিবিয়ে চিবিয়ে খেত। গঙ্গাপদ স্টীমারঘাটায় চাকরি পেলে বিনোদিনীর জন্যে কিনে এনেছিল এক কাঁচের গৌরাঙ্গঠাকুর। বিনোদিনী তখন থেকে ঠাকুরভক্ত। এমনি করে বিনোদিনী যুবতী হলো, ছেলেমেয়ের মা হলো, গিন্নী বউ হলো, যৌবন ফুরোলো, বুড়ো হয়-হয়, তারপর তার স্বামী গঙ্গাপদ মারা গেল। স্বামী মারা যাবার পর বিনোদিনী এই সংসারে কোথাও আর নিজেকে মানাতে পারল না। পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশী স্বামীর সঙ্গে তার নিজের জীবন এমন করে জড়ানো, যেন সে এবং তার স্বামী, তাদের সংসার, তাদের সম্পর্ক এক ধরনের জীবন-নকশা তৈরী করেছিল (ইংরেজীতে যাকে আমরা বলি প্যাটার্ন, তাই), স্বামীর মৃত্যুতে সে-নকশা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল। বিনোদিনীর জীবন এখন শূন্য, অর্থহীন, অকারণ। যেন যেতে যেতে একটি নদী হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেছে, তার আর প্রবাহ থাকল না। বিনোদিনীর মনের অবস্থার একটি বর্ণনা এই রকম ঃ যে রেখা এবং রঙ দিয়া বিধাতা তাহার জন্য এই সংসারেব একটি অতি ক্ষুদ্র চিত্র আঁকিয়াছিলেন, সেই রেখাগুলির অর্ধেক মুছিয়া গিয়াছে, অনেক রঙ

ধুইয়া গিয়াছে। এখন আর বিনোদিনী চিত্র নয়, আর কখনও তাহার চিত্র হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিনোদিনী তার এই শূন্যতা পূর্ণ করার জন্যে ছেলের কথা ভেবেছে, মন তেমন করে সাড়া দেয়নি; ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ভুলতে চেয়েছে, ভুলতে পারেনি। বিনোদিনীর বড় আদরের ছিল তার সেই কাঁচের শ্রীগৌরাঙ্গ, পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে কাঁচের গৌরাঙ্গকে সে নিত্য সেবা করেছে, গঙ্গাপদর অবর্তমানে গৌরাঙ্গও শুধুমাত্র কাঁচ হয়ে থাকল। শেষে বিনোদিনী একদিন হঠাৎ অনুভব করল: প্রতিমার বিসর্জন হয়, তাহার সাজ-শোভা, মাটি সবই গলিয়া যায়, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। মানুষের জীবনেও এই বিসর্জনগুলি অতি সত্য, গঙ্গাপদ ও বিনোদিনীকে কাহারা যেন বিসর্জনের বাজনা বাজাইয়া নদীর ঘাটে আনিয়া রাখিয়াছে, স্বামী গিয়াছেন, বিনোদিনীর জন্য নদীর জল অপেক্ষা করিতেছে। একই নদীর জলে উভয় মূর্তি ডুবিয়া গলিয়া একাকার হইয়া থাকিবে, বিনোদিনী ইহা ভাবিয়া ঈশ্বরকে আজ প্রণাম করিল।

'বিনোদিনীর দুঃখ' বসুধা তার মা'র কথা ভেবে লিখেছিল। তার মা আর বিনোদিনীতে তফাত নেই, ধর্মভীরু হওয়া সত্ত্বেও তার মা স্বামীর মৃত্যুর পর না বসুধা না বা ধর্মকে আশ্রয় করে সত্যকার সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। বসুধা বলত: মা পরকালও বিশ্বাস করে না। একমাত্র মৃত্যুকেই বিশ্বাস করে। আমি কিছু বুঝতে পারি না।

বসুধার মা মারা যাবার পর, বেশ কিছুদিন পর, সে আরো একটা গল্প লেখে। গল্পটির নাম 'দুঃখ মোচন'। এই বইয়ের সেটি দ্বিতীয় গল্প। একটি অপ্রচলিত পত্রিকায় গল্পটি ছাপা হয়েছিল। 'বিনোদিনীর দুঃখ' লেখা হয়েছিল সাধু ভাষার ঢঙে। বসুধা প্রথম দিকে তাই লিখত। 'দুঃখ মোচন' সে চলতি ভাষায় লিখেছে।

'বিনোদিনীর দুঃখ' গল্পে বিনোদিনীর শেষ সান্ত্বনা ছিল মৃত্যু। মৃত্যুকে বিনোদিনী দুঃখ মোচনের পরিণতি হিসেবে দেখেছিল।

কথাটা বোধ হয় ঠিক মতন বলা হলো না, বলা উচিত ছিল, বিনোদিনী মৃত্যুর মধ্যে এক ধরনের আত্মিক পুনামলন আশা করেছিল। 'দুঃখ মোচন' এ এই মৃত্যুকে যেন আরো বেশী করে যাচাই করবার চেষ্টা করেছে বসুধা।

আগে বলেছি, গল্পটা বসুধা তার মা মারা যাবার বেশ কিছু পরে লিখেছে। ওর মা যখন মারা যায় তখন বসুধার সঙ্গে একটি মেয়ের পরিচয় গড়ে উঠছিল। তার নাম এখানে গোপন রাখলাম, সুবিধের জন্যে আমরা তাকে নিরু বা নিরুপমা বলে উল্লেখ করব। বসুধা তার মা'র অসুস্থতার খবর পেয়ে দেশে চলে গিয়েছিল, এবং মা'র মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধকর্ম পর্যন্ত দেশেই ছিল। আমরা—আমি আর ভুবন—বসুধার মা'র শ্রাদ্ধের দিন তার দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বসুধা তখন আমাদের এক অদ্ভুত কথা বলল ; বলল যে, শ্মশানে যখন নদীর পাড়ে মা'র চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছিল তখন এক জামগাছের তলায় বসে সে প্রায় সারাক্ষণ নিরুর কথা ভেবেছে। তারপর এই যে ক'দিন—শোক আর অশৌচের পর্ব—এই ক'দিনও সে মা'র কথা অল্পই ভেবেছে, নিরুর কথাই ভেবেছে বেশী। কেন ?

বসুধার সব ব্যাপারেই 'কেন'-র বাতিক ছিল। মা'র জন্যে তার যেমন শোক পাওয়া উচিত ছিল, বেদনা বোধ করা কর্তব্য ছিল—তেমন শোক বা বেদনা সে পেল না, উপরন্তু নিরুপমার কথা ভাবল শুধু—এই গ্লানিতে তার মন অনেক দিন বিমর্ষ থাকল। যেন সে কত বড় অপরাধী, কী গুরুতর অন্যায় না করেছে! আমরা তাকে বোঝাতে পারিনি, অকারণে সে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে।

কিছুদিন ওইভাবে, বিমর্ষতা ও গ্লানির মধ্যে কাটল বসুধার। নিরুকেও সে অসুখী অপ্রসন্ন করে রাখল ; তারপর নিজের মনের মতন এক-উত্তর খুঁজে পেয়ে বসুধা 'দুঃখ মোচন' গল্পটি লিখল।

'বিনোদিনীর দুঃখ' গল্পে বিনোদিনী মৃত্যুর মধ্যে তার দুঃখের নিবৃত্তি অনুভব করেছে, 'দুঃখ মোচন'-এ সুখেন্দু অনুভব করেছে মৃত্যু নিষ্ক্রিয়,

জড়তুল্য ; জীবন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, মৃত্যু কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। সরল করে বললে কথাটা এই দাঁড়ায়, বিনোদিনী মৃত্যুকে গ্রহণ করে শান্তি পেতে চেয়েছিল, সুখেন্দু জীবিত থাকতে এবং সজীবতা থেকে শান্তি পেতে চাইল।

সুখেন্দু 'দুঃখ মোচন' গল্পের নায়ক। তার বয়স কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গল্পেব মুখ্য বিষয় আপাতত মনে হবে প্রেম : কিন্তু আমি মনে করি, মৃত ও জীবিত বা মৃত্যু ও জীবনের দ্বন্দ্ব। গল্পটির শুরু থেকেই আমরা দেখি, সুখেন্দু একটি অদ্ভুত দ্বিধার মধ্যে অত্যন্ত দুঃখীর মতন বেঁচে আছে। সে রেণু বলে একটি মেয়েকে ভালবাসে, অথচ তার মা'র সর্বগ্রাসী এক স্মৃতি তাকে রেণুর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে দিচ্ছে না। তার মনে সর্বদাই একটি অন্যায়ের ভয়, বিবেকের গ্লানি। সুখেন্দুর মনে হয়, সে যেন তার মা'র নিত্য অভিশাপ কুড়িয়ে বেঁচে আছে। এ-রকম কেন হয় সে বোঝে না, এইমাত্র বুঝতে পাবে, মা'র প্রতি যথোচিত কর্তব্যগুলি সে পালন করেনি।

মনের এই দ্বন্দ্ব থেকে সুখেন্দুকে আমরা উদ্ধার পেতে দেখব বলে যখন আর আশা করি না—তখন একটি ঘটনা থেকে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটছে। গল্পের শেষের দিকের অলৌকিক ঘটনাটির কথাই আমি বলছি। শীতের শুরু তখন, রেণুদের বাড়ির ছাদে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রেণু আর সুখেন্দু বসে গল্প করছিল। কলকাতার গলি ধোঁয়া-কুয়াশা আর গ্যাসের আলো ও ঈষৎ জ্যোৎস্নায় কেমন ঝাপসা হয়ে আছে। গল্প করতে করতে রেণু হঠাৎ উঠে গিয়েছিল, সুখেন্দু বসে ছিল। সহসা তার মনে হলো, কে যেন তার পাশে এসে বসে আছে। ঝাপসা জ্যোৎস্না ও ধোঁয়া-কুয়াশার মধ্যে নির্বাক সেই মূর্তিকে সে প্রথমে চিনতে পারল না, সাদা ছায়ার মতন লাগছিল যেন মূর্তিটিকে। সামান্য লক্ষ করার পর সুখেন্দু চিনতে পারল, তার মা। প্রথমে অবাক হলেও পরে সুখেন্দু যেন বুঝতে পারল, মা কেন এসেছে। মৃত

মা'র প্রতি তার করুণা ও মমতা হচ্ছিল, মা'র জন্যে দুঃখ হচ্ছিল। অদ্ভুত একটি উদাসীনতা ও চিন্তানুভূতি এসে তাকে গ্রাস করছিল যেন। মাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল সুখেন্দু—সহসা সে কেমন এক গন্ধ অনুভব করল। কিসের গন্ধ? কার গন্ধ? অন্যমনস্কভাবে মুখ নীচু করতে বুক-পকেটের মধ্যে থেকে ফুলের গন্ধ এল। মনে পড়ল, রেণু সামান্য আগে তার মাথার খোঁপা থেকে একটিমাত্র গোলাপ খুলে সুখেন্দুর পকেটে দিয়ে গিয়েছিল। গন্ধটি আশ্চর্য লাগল সুখেন্দুর, কত জীবন্ত, মনোরম, স্পর্শযোগ্য। রেণুর শরীর মন ভালবাসা, সব যেন সেই মুহূর্তে বিশাল এক ঢেউয়ের মতন এসে তাকে ভাসিয়ে নিল। সুখেন্দু সেই অবস্থায় কোনো রকমে তার মাকে বলল: তুমি আর এসো না।

বসুধা নিজের বেলায় যে গ্লানি অনুভব করেছে, সুখেন্দুর মধ্যে দিয়ে সেই গ্লানি কাটিয়ে উঠেছে। মৃত মা'র জন্যে তার ভীষণ কোনো শোক অথবা বেদনা হয়নি, অথচ নিরুর চিন্তাতে তন্ময় হয়েছিল—এই গ্লানিবোধের জন্যে তার যে দুঃখ জন্মেছিল, সেই দুঃখ তার মোচন হলো এতদিনে। নিরু জীবিত বলেই তার আকর্ষণ বেশী, নিরু জীবিত বলেই সে প্রয়োজনীয়। জীবনই প্রেম।

'দুঃখ মোচন' ঠিক প্রেমের গল্প নয়, প্রেম এই গল্পে উপজীব্য বিষয় নয়। মানুষ মাত্রেই জীবনের প্রতি আসক্ত, এবং এই আসক্তি ভিন্ন কোনো জীব জীবিত হতে পারে না, বসুধা যেন সেই কথাই বলতে চেয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, বসুধার এই গল্পটি তার নিজের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল। সুখেন্দু নিমিত্তমাত্র।

এই বইয়ের তৃতীয় গল্প 'নরক হইতে যাত্রা'। আমি আগে বলেছি, আরো একবার স্মরণ করিয়ে দি, এই গল্পটির নামেই প্রথমবার তার বই আমরা ছেপেছিলাম। এবারেও ওই নাম রাখা হয়েছে।

'দুঃখ মোচন' গল্পটি লেখার প্রায় বছর খানেক পরে বসুধা এই

গল্পটি লিখেছিল। গল্পটিকে প্রেমের গল্প বলা যায়। অবশ্য প্রেমের গল্পের নাম 'নরক হইতে যাত্রা'—এ যেন খুবই অদ্ভুত শোনায়।

'নরক হইতে যাত্রা'-য় একটি যুবকের প্রেম-পিপাসা, প্রেম এবং পরে তার ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে। গল্পের নায়ক বসুধা নিজে, যদিও লেখায় নায়কের নাম পরিমল। এখানে নায়িকার নাম কিন্তু সত্যিই নিরুপমা। কলকাতার সদানন্দ চৌধুরী লেনের যে বাড়িতে নিরুপমা থাকত, তার নীচের তলায় পরিমলের এক বন্ধু থাকত। মাঝে মাঝে পরিমল বন্ধুর কাছে যেত। সেই সূত্রে নিরুপমার সঙ্গে পরিচয়।···পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে কিছুটা সময় নিশ্চয় লেগেছিল, কিন্তু এ-কথা বেশ বোঝা যায়, প্রথম থেকেই পরিমল নিরুপমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। পরিমল ছিল সেই ধরনের ছেলে—ভালবাসাকে যারা অনেকটা দৈবশক্তির মতন মনে করে, এখনো বিশ্বাস করে ভালবাসায় মানুষের হৃদয় উজ্জীবিত হয়। মুখচোরা, লাজুক এবং ভাবুক গোছের এই ছেলেটিকে খুব সাধারণ মেয়ে নিরুপমার ভাল না লাগার যথেষ্ট কারণ ছিল। নিরুপমা ছিল স্বভাবে খুবই সাধারণ।

গল্পের প্রথমাংশে পরিমল এবং নিরুপমার ক্রম-ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার কাহিনী আছে। দ্বিতীয়াংশে তাদের ভালবাসার সম্পর্ক। এই ভালবাসাকে পরিমলের তরফ থেকে গভীর ও আন্তরিক বলতে কোথাও বাধা দেখি না। পরিমল ভাবত, এই প্রেম তার অস্তিত্বকে সার্থক করেছে, তার জীবনকে মূল্যবান করেছে; নিরুপমা অত ভাবত না, ভাবার কারণ দেখত না। হয়তো সে ভাবতে জানত না। তবু, যুবতী যে কোনো মেয়ের মতন তার কিছু রোমাঞ্চ ছিল এই প্রেমে।

এই ভালবাসা একদিন ভেঙ্গে গেল। কেন ভাঙল বোঝা যায়। তবু, কখনো মনে হবে নিরুপমাদের বাড়ির নীচের তলার ভাড়াটে পরিমলের বন্ধু মন্মথর ইতরতা ও চতুরতার জন্যে এই প্রেম নষ্ট হয়েছিল; কখনো মনে হবে দোষটা পরিমলেরই; আবার এক এক সময় নিরুপমাকেই দায়ী করতে ইচ্ছে হয়। মন্মথকে যদি কারণ বলে

ধরি, তবে দেখব, মন্মথ পরিমলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিরুপমাকে লাভ করার চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু সে অতিরিক্ত চতুর বলে সরাসরি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি ; গোপনে করেছিল, সাদামাটা সাংসারিক পথে, ধূর্ত ভাবে। সে নিরুপমার মাকে বশ করতে পেরেছিল, এমনকি নিরুপমাকেও। নিরুপমার মা সংসার বুঝতেন, মেয়ের সুখশান্তি বুঝতেন, ভালবাসাবাসি তেমন বুঝতেন না। পরিমলকে তিনি যোগ্য পাত্র বলে মনে করলেন না। নিরুপমাও কেমন ভুল করেছিল। মন্মথর চাতুর্য এবং শক্ত-সমর্থ দাবি তার কাছে অনেক আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। তা ছাড়া মায়ের দিক থেকে পরিমলকে গ্রহণ করায় বাধা ছিল প্রবল। নিরুপমার ছেলেবেলা থেকেই সবরকম অসুস্থতার ওপর ভয় ছিল, ঘৃণা ছিল। পরিমলকে তার কেমন অসুস্থ বলে মনে হতো। পরিমলকে সে অনেক দিন প্রেমিক হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভেবে পায়নি, এই প্রেম যখন ব্যবহার্য বিষয় হয়ে উঠবে সংসারে, তখন—তখন কি হবে ? শান্তি বা সুখ কি পাবে নিরুপমা ? তার মনে হয়নি পরিমল তাকে গার্হস্থ্য সুখশান্তি দিতে পারবে।

পরিমলের দোষের কথা যদি ভাবি, তবে দেখব, পরিমল অনেকখানি পথ যেন অক্লেশে পেরিয়ে এসে হঠাৎ কেমন থমকে দাঁড়াল। কেন দাঁড়াল তা বলা উচিত। খুব সম্ভব পরিমল ভালবাসার মধ্যে যেটুকু পাবার পেয়ে গিয়েছিল এবং ভালবাসার বিষাদ ও অসম্পূর্ণতার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। এক জায়গায় পরিমল ভালবাসার তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির কথা ভাবতে বসে দেখেছে, প্রেমের কোনো স্থায়িত্ব নেই, আজ যেমন আছে চিরকাল তেমন থাকবে না। ভালবাসার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা ও বিষাদ তা এই কারণে যে, অন্য সকল অজড় সৌন্দর্যের মতন তার ক্ষয় আছে, পরিবর্তন আছে।···পরিমল বোধহয় অক্ষয় প্রেম, অপরিবর্তনীয় প্রেম কামনা করছিল, যা এ-সংসারে অসম্ভব।

নিরুপমার দোষ এই, সে সাধারণ মেয়ে। নিতান্ত সাধারণ

চোখে সে প্রেম এবং ঘর-সংসার সুখ দেখতে চেয়েছে। পরিমলকে গ্রহণ করতে সে দ্বিধা করেছিল। এই দ্বিধার অনেকটা মন্মথ মারফত এসেছে, বাকিটা নিরুপমার সাধারণ ইচ্ছার জন্যে এসেছে।

'নরক হইতে যাত্রা', বসুধার নিজের গল্প। নিরুর প্রেম শেষাবধি তাকে শান্তি দেয়নি। এমনকি নিরুকে সত্যিই তার কোনো এক বন্ধু বিয়ে করে নিয়েছিল। প্রেমের এই ব্যর্থতা আমরা যেভাবে গ্রহণ করতাম, বসুধা সেভাবে গ্রহণ করেনি। সে বলত, আমাদের প্রেমের ধারণা খুব ছোট, শুধু একটিমাত্র মানুষকে অবলম্বন করে; সে ছেড়ে গেলে দুঃখে মরে যাই, ছটফট করি, কাতর হই। কেন এমন হবে? কেন?

'কেন'-র ভূত কোনোদিন ওর ঘাড় থেকে নামেনি। বলতে নেই, বসুধা আমাদের এই ছোটখাটো ভালবাসাকেই পছন্দ করেনি। এই ভালবাসাকে সে শেষ পর্যন্ত বাতিল করেছে। সে দেখেছে, আমাদের এই সংসারের শত রকম গ্লানি, তুচ্ছতা, ধূর্ততা, প্রাপ্তির ইচ্ছা আমাদের আত্মিক দীনতাকে ক্রমশই দীন করে তুলেছে। তার ধারণা—আমরা নিজেদের দীনতার জন্য নরকবাসী জীব হয়ে আছি। এই নরক থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টাই তার 'নরক হইতে যাত্রা'। ব্যক্তিগত প্রেম ও প্রাপ্তি থেকে সম্ভবত সে কোথাও চলে যাবার চেষ্টা করেছিল।

কলকাতা ছেড়ে বসুধা যে বছর চলে গেল, সে বছর আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী বসুধার লেখার খুব অনুরাগী ছিল কিনা জানি না, তবে তাকে চিনত। বসুধাকে আমি বিয়ের সময় থাকতে বলেছিলাম, সে থাকেনি। তার মাস কয় মাত্র আগে আমরা তার বই ছেপেছিলাম।

বসুধার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ যোগাযোগ আর ঘটেনি। বছরে এক-আধবার তার চিঠি পেয়েছি। ভুবনও আমার মতন কদাচিৎ একটা-দুটো চিঠি পেত। আমরা বসুধার চিঠি থেকে বুঝতে পারতাম

সে বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। তারপর দেখলাম সে খুব ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। আর একেবারে শেষে জানলাম, সে ঈশ্বর বিসর্জন দিয়ে সেবাব্রতী হয়ে উঠেছে।

বসুধার শেষ দুটি লেখা সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য নেই। আমি নরকবাসী জীব। নরক থেকে যাত্রা শুরু করে বসুধা যেসব পথে যাবার চেষ্টা করেছে তার খোঁজ আমি রাখি না। হয়তো তার চতুর্থ গল্প 'ঈশ্বর' এবং পঞ্চম গল্প 'আশ্রয়' তার জীবনের শেষ কয়েক বছরের ইতিবৃত্ত জানাতে পারবে। এই দুটি লেখাই ভুবন কাশী থেকে ফেরার সময় সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মেয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল। লেখা দুটির পাণ্ডুলিপি থেকে বেশ বোঝা যায়, দুটি লেখাই অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত ; পড়ার পর পাঠকও তা অনুভব করতে পারবেন।

'ঈশ্বর' গল্পটি স্বাভাবিক ধাঁচে লেখা গল্প নয়। আমরা এটিকে প্রতীকী গল্প বলতে পারি। পড়তে বসলে অসাধারণ এক সারল্যের স্বাদ পাব। শেষাবধি অবশ্য কিসের যেন অভাব বোধ করি। গল্পের শুরুতেই অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যাবে একটি পথযাত্রী কোনো এক দুর্যোগের সময় অন্ধকারে এক মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্ধকারেই সাক্ষাৎ ঘটল। কথাবার্তার মধ্যে এক সময় সন্ন্যাসী বললেন, তাঁর ঝুলিতে একটা প্রদীপ আছে, অলৌকিক প্রদীপ, তাকে যে কোনো সময় যে কোনো দুর্যোগে জ্বালিয়ে নিয়ে পথ চলা যায়। যাত্রী বলল, 'তবে আপনি কেন সে-প্রদীপ না জ্বালিয়ে এই অন্ধকারে বসে আছেন ?' সন্ন্যাসী বললেন, 'আমার কাছে তিনটি প্রদীপ, তার একটি আসল, দুটি নকল। আমি আসল-নকল ভেদাভেদ করতে পারছি না অন্ধকারে।'

শুনে যাত্রীর আকাঙ্ক্ষা হলো, আহা, যদি তার হাতে প্রদীপগুলি থাকত, বড় ভাল হতো। সন্ন্যাসী যেন এই আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারলেন তার। বললেন, 'তুমি যদি পার, আসলটি খুঁজে নাও।'···যাত্রী প্রদীপগুলি তার হাতে দিতে বলল। সন্ন্যাসী দিলেন। অন্ধকারে

যাত্রীর কাছে তিনটি প্রদীপই একই রকম মনে হলো, সে ভেদাভেদ করতে পারল না···সন্ন্যাসী বললেন, 'পারলে না ?' যাত্রী বলল, 'না।' সন্ন্যাসী তখন প্রদীপ তিনটি ফেরত নিয়ে বললেন, 'এর একটি নিশ্চয় জ্বলবে। যে জ্বালাতে জানে তার হাতে জ্বলবে। সে নিজের গুণে জ্বালিয়ে রাখতে পারবে।'

গল্পটি এখানে শেষ হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি দেখে বোঝা যায়, বসুধা আরো কিছু লিখতে চেষ্টা করেছিল অনেকবার, পারেনি। সম্ভবত সে এই হেঁয়ালির কোনো অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, বিফল হয়েছে।

শেষের গল্পটির নাম 'আশ্রয়'। কাশী শহর নিয়ে লেখা গল্প। গল্পের শুরু আছে শেষ নেই। বসুধা উত্তমপুরুষে গল্পটি লিখতে শুরু করেছিল। শীতের দিকে কাশীর গ্রামাঞ্চলে মড়ক বাধে প্রতি বছর। সেবারে ভীষণ মড়ক বেধেছিল, লোকজন পালাচ্ছিল, সরকারী লোকজনও গ্রামে যাচ্ছিল না, গঙ্গার ঘাটে অবিরাম চিতা জ্বলছিল। গল্পের নায়ক একদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ি আসার পথে অনুভব করল, গ্রামান্তর থেকে কে যেন তাকে ডাকছে, সম্ভবত সেই গ্রাম্য বন্ধুটি, যে তাকে গ্রাম্য সুরে দোঁহা গেয়ে শোনাত।

···বসুধা যেন সেই দোঁহার সুর শুনতে পেল : আমরা বড় দুঃখী, বড় চঞ্চল, গাছের যেমন শেকড় আছে আমাদের তেমন শেকড় নেই ; আমরা এক জায়গায় থাকতে পাবি না।

বসুধা আর বাড়ি ফিরল না, গ্রামান্তরের দিকে—যেদিকে মড়ক—সেদিকে চলে গেল।

গল্পটি ওই পর্যন্ত লেখা ; পরে আর লেখা হয়নি। ভুবন বলে, গল্পটি লেখার পরের দিন বসুধা কোথায় চলে গিয়েছিল, সেই কাশীর বৃদ্ধ বা তার মেয়ে জানে না।

ছোটনাগপুরের এক অখ্যাত জায়গায় মিশনের এক হাসপাতালে বসুধা মারা যায়। আমরা তার মৃত্যু-সংবাদ জেনেছি অনেকদিন

পরে। হাসপাতালে সে কিছু লিখেছিল বলে মনে হয় না। তার লেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

বসুধার সমস্ত লেখার বিচার আমি বন্ধু হিসেবে করেছি, হয়তো অন্যায় করেছি, কিন্তু আমার পক্ষে সেইটাই স্বাভাবিক। পাঠক আমায় মার্জনা করবেন।

এই বইয়ের গোড়ায় একটি উৎসর্গপত্র আছে। প্রথম বারেও ছিল। বলা বাহুল্য, সেই উৎসর্গপত্রে যে নিরুপমা রায়-এর নাম উল্লেখ আছে তিনি আমার স্ত্রী নন, ইনি বসুধার সেই নিরুপমা।
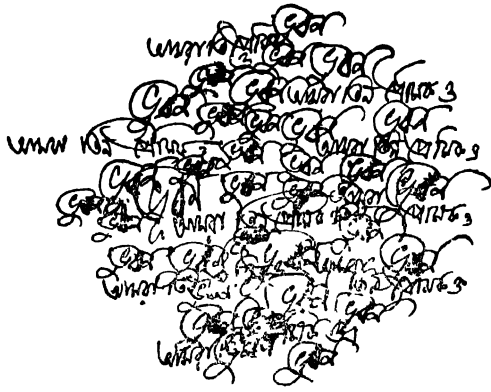
আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন / আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

নদীর চরায় শিবানীর চিতা জ্বলছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমুলগাছের তলায় বসেছিলাম। ফাল্গুনের শেষ, উলটো টান ধরে গিয়েছিল দুপুরে। রোদ পাখা গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে, নদীর বাঁকের মাথায় আকাশে সূর্য হেলে পড়ছিল।

ভুবন গরুর গাড়ির ওপর বসে, গাড়িটা অর্জুনগাছের ছায়ায় দাঁড় করানো, গরু দুটো গাছগাছালির ফাঁকে শুয়ে ছিল। শিবানীর মুখাগ্নি শেষ করে ভুবন খানিকক্ষণ চিতার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, রোদ আর আগুনের ঝলসানি গায়ে মাখেনি, তারপর গাড়িতে গিয়ে বসেছে। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে মুখ আড়াল করে সে বসে ছিল, কদাচিৎ মুখ তুলছিল, তুলে শিবানীর চিতা দেখছিল।

চিতার কাছাকাছি, নদীর ভাঙা পাড়ের আড়ালে চার-পাঁচটি ছেলেছোকরা আর নিত্যানন্দ। তারা মাথায় গামছা বেঁধে, ভিজে তোয়ালে মুখে ঘাড়ে বুকে বুলিয়ে শবদাহের তদারকি করছিল।

পুরুতমশাই আর ছোটকিলাল অনেকটা তফাতে, মাটির কয়েকটি সরা ও কলসি সামনে নিয়ে গাছের ছায়াতেও ছাতা খুলে বসে আছে।

আমরা মাঝদুপুরে এসেছি। তখন চতুর্দিক ধুধু করছিল। গরম বাতাস গায়ে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। এতক্ষণে যেন সব ক্রমশ জুড়িয়ে আসার মতন ভাব হয়েছে। বালিভরা নদীর তাপ মরে আসছিল, শীর্ণ জলের ধারাটি শিবানীর চিতার পাশ দিয়ে বয়ে যেতে যেতে কদাচিৎ বাতাসে কিছু শীতলতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমুলতলায় বসে শিবানীর সৎকার প্রত্যক্ষ করছিলাম।

সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে অনাদি বললে, "শেষ হতে হতে বিকেল পড়ে যাবে।" বলে সে শিবানীর চিতার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কমলেন্দু পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসে ছিল, সে আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ল, আকাশমুখো হয়ে বোধহয় শিমুলের ফুল দেখবে।

আমি আর-একবার ভুবনের দিকে তাকালাম। ভুবন কুঁজো হয়ে বসে, হাঁটুর ওপর মাথা, দু' হাতে মুখ আড়াল করা। অনেকক্ষণ সে ওই একইভাবে বসে আছে। তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক: শিবানী ওর স্ত্রী। তবু আমার মনে হলো, ভুবনের এতটা শোকাভিভূত ভাব ভাল দেখাচ্ছে না। সে জোর করে তার শোকের মাত্রার গভীরতা দেখাতে চাইছে। এতটা শোক পাবার কারণ তার নেই। তবু এই শোক কেন? সে কি আমাকে ঈর্ষান্বিত করতে চায়? কিংবা আমাদের তিনজনকেই?

কথাটা আমার এখন বলা উচিত নয় বুঝতে পেরেও যেন ভুবনের শোকে খুঁত ধরাতে বললাম, "শিবানীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে মাসখানেক আগে। ভুবনের ওপর কি জন্যে যেন রেগে ছিল। ওর শরীর স্বাস্থ্যের কথায় দুঃখ করছিল···"

আমার কথায় অনাদি মুখ ফিরিয়ে দূরে ভুবনের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শেষে অন্যমনস্কভাবে বলল, "আমরা বোধ হয় না এলেই ভাল করতাম।"

আমরা চুপচাপ, অনাদির কথাটা ভাবছিলাম। সবুজ একটা বুনো পাখি চিকির-চিক করে ডাকতে ডাকতে চোখের পলকে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। কমলেন্দু সব জেনেশুনে বুঝেও হঠাৎ বলল, "কেন? আমরা না এলে কি ভাল হতো?"

অনাদি ধীরস্থির প্রকৃতির, আস্তে আস্তে নীচু গলায় সে কথা বলে। সামান্য অপেক্ষা করে সে বলল, "ভুবন হয়তো অস্বস্তি বোধ করছে। ঠিক এ সময়ে সে বোধহয় আমাদের বাদ দিয়েই তার স্ত্রীকে ভাবতে চেয়েছিল।"

"ভাবুক; কে তাকে বারণ করেছে—" খানিকটা অবহেলা, খানিকটা উপহাসের গলায় আমি বললাম।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। "আমরা ওর চোখের সামনে বসে থাকলে ভুবনের পক্ষে আমাদের বাদ দিয়ে শিবানীকে ভাবা মুশকিল।"

কমলেন্দু শুয়ে শুয়ে বলল, "বেশ তো, তা হলে সাত-সকালে লোক দিয়ে আমাদের বাড়িতে শিবানীর মারা যাবার খবর পাঠানো কেন! না পাঠালেই পারত।"

"কিংবা বলে দিলেই পারত আমরা যেন না আসি," আমি বললাম।

"খবর না দিলে খারাপ দেখাত, বোধ হয় ভদ্রতা করে···"

"আমরাও ভদ্রতা রক্ষা করছি। শিবানী আমাদের বন্ধুর স্ত্রী, তার সৎকারে না আসাই কি ভাল দেখাত!" কমলেন্দু বলল।

"বন্ধুর স্ত্রী শুধু কেন, শিবানী আমাদের···কি বলব···বান্ধবী, যাই

বলো…সেও তো আমাদের কিছু একটা ছিল। সে মারা গেছে, আমরা শ্মশানে আসব না ?" আমি বললাম।

অনাদি আর কথা বাড়াল না। পকেট হাতড়ে আবার সিগারেট বের করল। আমাদের দিল। নিত্যানন্দ চিতার কাছে গিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে কাঠ ফেটে শব্দ হলো। সে চেঁচিয়ে কি যেন বলল, তার সহচর দুটি ছেলে তার কাছে গেল। ভুবন মুখ তুলে চিতার দিকে তাকিয়ে আছে। 'চিতার ওপর কয়েকটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন আতস বাজির মতন বাতাসে উড়ে ফেটে গেল, সামান্য ছাই উড়ল। একটি ছেলে কয়েকটি কাঠের টুকরো ফেলল চিতায়।

ভুবন চিতার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে উদাসভাবে নদী আকাশ আর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর এক সময় আমাদের দিকে মুখ ফেরাল। আমাদের মধ্যে দূরত্ব সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। ভুবন মুখ ফিরিয়ে নিল ; নিয়ে হাঁটুর ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর এই ভঙ্গি আমার ভাল লাগছিল না। মনে হলো, আমাদের যেন সে আর দেখতে পারছে না ; বা দেখেও দেখতে চাইছে না—উপেক্ষা করছে।

বাড়াবাড়ি দেখলে আমার রাগ হয়, ভুবনের এতটা বাড়াবাড়ি দেখে আমার কেমন রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল। আতিশয্য কেন ? আমরা কি জানি না শিবানীর সঙ্গে ভুবনের সম্পর্ক কি ছিল ? তবে ? তবু ভুবন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমরা কিছু জানি না, যেন শিবানী তার সর্বস্ব ছিল, শিবানীর মৃত্যুতে তার বিশ্বভুবন অন্ধকার হয়ে গেছে !

দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পাচ্ছিল। ভুবনের বোকামির শেষ নেই। তুমি যে কাকে এত শোক দেখাচ্ছ, ভুবন, তবু যদি শিবানীর ভালবাসা পেতে ! শিবানী তোমায় ভালবাসেনি, যদিও শেষ পর্যন্ত তোমায় বিয়ে করেছিল। তুমি স্বামী হয়েছিলে বলেই যা পাবার পেয়ে গেছ, তা ভেব না। বরং শিবানীর ভালবাসা বলতে যা, তা আমি পেয়েছিলাম।

ফাল্গুনের দমকা বাতাস এল দক্ষিণ থেকে, নদীর তপ্ত বালির ওপর দিয়ে ঘূর্ণি তুলে ঘোলাটে বাতাস নাচতে নাচতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। ভুবন আবার হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে হাত আড়াল করে বসল। যেন সে কাঁদছে।

ভুবনের এত আতিশয্য আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। অনাদি আর কমলেন্দুকে বললাম, "আমরা একটু আড়ালে গিয়ে বসি না হয়—" বলে উপহাসের গলায় মন্তব্য করলাম, "ভুবনবাবুর আমাদের হয়তো সহ্য হচ্ছে না, অনাদি যা বলল।"

কমলেন্দু শিমুলফুল দেখছিল, নাকি আকাশ, কে জানে! সে বলল, "তাতে যদি ভুবন শান্তি পায় আমার আপত্তি নেই।...আমার বরং শিবানীর চিতার কাছে বসে ওদিকে তাকিয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগছে।"

"তাই বুঝি শুয়ে আছ, আকাশ দেখছ?"

কমলেন্দু কথার জবাব দিল না।

অনাদি এবার বলল, "আমারও কেমন অস্বস্তি লাগছে।...একটু আড়ালে দূরে গিয়ে বসাই ভাল। তাছাড়া এবার এদিকে রোদ ঘুরে গেছে, বসে থাকা যাবে না।"

আমরা আরো অল্পক্ষণ বসে থেকে শিমুলতলা ছেড়ে উঠে পড়লাম। তারপর তিন বন্ধু শিবানীর চিতা এবং ভুবনের দৃষ্টি থেকে সরে অন্য দিকে চলে যেতে লাগলাম।

খানিকটা দূরে এসে আমরা বসলাম। এখানে ঘন ঝোপঝাড় আর ছায়া, মাথার ওপর নিমগাছ, সামনে কুলঝোপের ওপর দিয়ে নদী দেখা যায়। মাঝে মাঝে পাখির ডাক ছাড়া আর কিছু কানে যাচ্ছে না, নদীর বালি ছাড়া অন্য কিছু চোখেও পড়ছে না। এখানে যে যার মতন আরাম করে বসলাম, বসে নিশ্চিন্ত হলাম।

কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে ছোটখাটো দু-চারটি কথার বিনিময় হলো; শিবানী এভাবে, আচমকা একটা অসুখে মারা যাওয়ায় আমরা

দুঃখিত। শেষে আমরা একে একে কেমন নীরব হয়ে গেলাম। নদীর দিকে অপরাহ্লের স্তিমিত ভাব নামছিল। আমরা তিনজনেই কখনো নদী, কখনো শূন্যতা, কখনো গাছপালা, কখনো পায়ের তলায় ঘাস-মাটি দেখছিলাম। এবং পরিপূর্ণ নীরব হয়ে গিয়েছিলাম।

অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থাকার পর হঠাৎ কমলেন্দু কেমন করে যেন নিশ্বাস ফেলল। দীর্ঘ নিশ্বাস নয়, তার চেয়েও যেন গভীরতাপূর্ণ কিছু; তার নিশ্বাসের শব্দে আমরা ওর দিকে সচকিত হয়ে তাকালাম।

কমলেন্দু সুপুরুষ। তার মুখ এখনো দু' মুহূর্ত তাকিয়ে দেখার মতন। লম্বা ধরনের কাটাকাটা মুখ, রঙ ফরসা, নাক এবং চোখ বেশ তীক্ষ্ণ। তার ফরসা সুন্দর মুখে আমরা কোথায় যেন এক বেদনা দেখতে পেলাম।

অনাদি বলল, "কি হলো ?"

কমলেন্দু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আমাদের দিকে তাকাল। শেষে বলল, "না, কিছু নয়।...কই, দেখি একটা সিগারেট..."

পকেট থেকে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ওকে দিলাম। নিজে একটা সিগারেট নিয়ে ও আমাদের দু'জনকে দুটো সিগারেট দিল। দেশলাই জেলে সিগারেট ধরিয়ে অনেকটা ধোঁয়া গলায় নিল। তারপর আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ দিকটায় পালিয়ে এসে ভালই হয়েছে।...সাম হাউ, আমার শিবানীর চিতার সামনে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না।...হতে পারে, তখন আমি বোকা ছিলুম, বয়স কম ছিল; তবু এ কথা তো ঠিক, শিবানী আমাকে ভালবেসেছিল।...আমার চেয়ে বেশী সে আর কাউকে কখনো ভালবাসেনি।"

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু পরস্পরের কথা জানতাম, এবং ভুবন, আমাদের চতুর্থ বন্ধুও, সব জানত। কমলেন্দুর সঙ্গে শিবানীর

মেলামেশা ভালবাসার কথা আমার অজানা নয়; কিন্তু এই মুহূর্তে সে যে দাবীটুকু জানাল তাতে আমার আপত্তি হলো না। সবচেয়ে বেশী ভালবাসার কথা উঠলে শিবানীর কাছে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী পেয়েছে এ আমি বিশ্বাস করি না। একেবারে সরাসরি না হলেও, কমলেন্দুকে শোনাবার জন্যে, ঠাট্টার একটু গলা করে বললাম, "আমার তো মনে হয়, ওটা আমিই এক সময়ে পেয়েছি।"

ধীরস্থির শান্তশিষ্ট মানুষ হলেও অনাদি এখন হঠাৎ কেমন অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হলো। ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে বলল[1] "এ-সব তোমাদের মনের ধারণা, কল্পনা। আমার সঙ্গে শিবানীর ঘনিষ্ঠতা এমন সময়ে হয়েছে যখন আমরা দু'জনে কেউই বাচ্চা ছিলাম না। সিরিআসলি যদি কাউকে সে ভালবেসে থাকে, আমি সে দাবী সবচেয়ে বেশী করতে পারি।"

অনাদির কথায় আমি বা কমলেন্দু, আমরা কেউই খুশী হলাম না। আমাদের কথায় অনাদিও হয়নি। তিনজনে আজ আমরা যে দাবী করছি সে দাবী ছেড়ে দেওয়া কেন যেন আমাদের সাধ্যাতীত বলে আমার মনে হলো। আমাদের তিনজনেরই বয়েস হয়েছে, চল্লিশের এপারে চলে এসেছি। আমাদের তিনজনেরই স্ত্রী আছে, সন্তান আছে। আজ শিবানীর সঙ্গে আমাদের প্রেম নিয়ে অকারণ গল্প করার বা মনোমালিন্য সৃষ্টি করার কোনো অর্থ ছিল না। তবু, আমরা তিনজনেই এমন এক দাবী জানাচ্ছিলাম যেন সেই দাবী প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আমাদের কোনো বিশেষ সুখ ও অহংকার প্রকাশ করা যায় না।

কমলেন্দু ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল সিগারেটে, সে অনাদির দিকে এবং আমার দিকে বার বার তাকাল, তারপর সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে শিবানীর ওপর-ওপর মেলামেশা তোমরা দেখেছ; আমি তোমাদের সে-সব গল্পও বলতাম; চিঠিপত্রও

দেখিয়েছি ; কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমাদের কি হয়েছিল তোমরা কি করে জানবে ?”

“ভেতরে ভেতরে যা হয়েছে তাও তো পরে তুই বলেছিস,” আমি বললাম।

“না, আমি সব বলিনি। কিছু না-বলা আছে, সামথিং সিকরেট···”

“সে-রকম গোপনীয়তা আমারও আছে, কমল।” অনাদি বলল।

আমারও গোপনীয়তা ছিল। আমরা তিন বাল্যবন্ধু পরস্পরের কাছে জীবনের কোনো কিছুই বড় একটা অগোচর রাখতাম না। শিবানীর বেলায়ও কিছু রাখিনি—রাখতে চাইনি, তবু শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় কিছু রেখেছিলাম, নয়তো আজ এ-কথা উঠত না। শিবানীর সঙ্গে মেলামেশার সময়ও আমরা কেউ কারুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইনি। কেন না—কমলেন্দু শিবানীর সঙ্গে কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে মেলামেশা করেছিল, করে শিবানীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল ; শিবানীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা একেবারে যৌবন-বেলায় ; আমার সঙ্গে শিবানীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর অনাদির সঙ্গে শিবানীর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। শিবানীও আমাদের বাল্যকালের বান্ধবী। তার সঙ্গে আমাদের যা যা হয়েছে তা পরস্পরকে আমরা জানিয়েছি। স্বভাবতই কোনো ইতর ঈর্ষা আমাদের থাকার কথা নয়, তবু যদি কোনো ঈর্ষা থেকে থাকে বা হয়ে থাকে তা তেমন কিছু নয়। নয়তো আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটত এবং আমাদের এই বন্ধুত্ব বজায় থাকত না। এতকাল যা হয়নি আজ তা হওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। শিবানীকে নিয়ে কোনো বিরোধ আমাদের মধ্যে হয়নি ; সে জীবিত থাকতে যা হলো না, আজ যখন সে আমাদের মধ্যে আর নেই—তখন তা হবার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

আমার কি রকম যেন মনে হলো। কমলেন্দুর দিকে তাকালাম, তারপর অনাদির দিকে। আমার মনে হলো, ওরা নিজেদের গোপনীয়তাকে তাদের প্রতি শিবানীর চরম ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে মনে করছে। আমি নিজেও প্রায় সেইরকম মনে করছিলাম। যদিও আমার আরো কিছু মনে হচ্ছিল।

কেমন এক অস্বস্তি এবং কাতরতাবশে আমি বললাম, "একটা কথা বলব ?"

ওরা আমাকে দেখল।

"আমাদের সব কথাই সকলের জানা।" ধীরে ধীরে আমি বললাম, "আমরা কিছুই লুকোচুঁরি রাখিনি ; তবু আমাদের তিন-জনেরই কিছু গোপনতা আছে। আজ সেটা বলে ফেলা কি ভাল নয় ?"

কমলেন্দু অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। অনাদি চোখের চশমাটা ঠিক করে নিল। আমার মনে হলো ওরা অনিচ্ছুক নয়।

কমলেন্দু বলল, "বেশ। তাই হোক। কথাটা আজ বলে ফেলাই ভাল।"

অনাদি বলল, "আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শিবানীর চিতা এখনো জ্বলছে, আমরা শ্মশানে। এই সময় সে-সব কথা বলা কি ভাল দেখাবে !"

"খারাপই বা কি !" আমি বললাম, "আমার বরং মনে হচ্ছে, বলে ফেললেই স্বস্তি পাব।"

অনাদি আস্তে মাথা নাড়ল। সে সম্মত।

কমলেন্দুর দিকে আমি তাকালাম। সে-ই বলুক প্রথমে। শিবানীর জীবনে সেই প্রথম প্রেমিক।

"সব কথা বলার কোনো দরকার নেই কমল, আমরা জানি। আমরা যা জানি না তুমি শুধু সেইটুকুই বলো।"

কমলেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "তাই বলব।"

কমলেন্দু বলল :

"তোমাদের নিশ্চয় মনে নেই, আমি একবার মাস দেড়েক কি দুয়েকের জন্যে মোতিহারিতে ছোটকাকার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এলাম যখন, তখন বর্ষার শুরু, আমাদের ম্যাট্রিকের রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে। বাবা পাটনায় মেসোমশাইকে আমার কলেজে ঢোকার সব ব্যবস্থা করতে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট কি হয়েছিল তোমরা তা জানো। কলেজে পড়তে যাবার আনন্দে তখন খুব মশগুল হয়ে আছি, বাড়িতে চব্বিশঘণ্টা আদরের ঘটা চলছে। শিবানীর সঙ্গে আমার তখন গলায়-গলায়। মোতিহারিতে সে আমায় চিঠি লিখত। তার মা-বাবার কথা তোমরা জান, পয়সাকড়ি থাকার জন্যে, আর তার বাবা মনোজকাকা বেভিন-স্কীমে বিলেত ঘুরে আসার পর আরো একটু সাহেবী হয়ে গিয়েছিলেন। শিবানীকে শাড়ি ধরাতে ওঁরা দেরি করেছিলেন। আমি যখন মোতিহারিতে তখন শিবানী শাড়ি ধরেছে। চিঠিতে আমায় লিখেছিল। ফিরে এসে দেখলাম, ছিপছিপে শিবানীকে শাড়ি পরে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে—বেশ বড় হয়ে গেছে—বেশ বড়।···কই, আর একটা সিগারেট দাও তো··· ।"

অনাদি কমলেন্দুকে সিগারেট দিল। সিগারেট ধরিয়ে কমলেন্দু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকল সামান্য, তারপর বলল :

"একদিন বিকেলবেলা নাগাদ সাংঘাতিক বৃষ্টি নেমেছিল। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। এক একটা বাজ পড়ছিল—যেন মনে হচ্ছিল ঘরবাড়ি গাছপালায় আগুন ধরিয়ে ছাই করে দেবে। আর তেমনি আকাশ, পাকা জামের মতন কালো।···দেখতে দেখতে যেন সন্ধ্যে। দোতলায় আমার ঘরে আমি দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে। একটা জানলা, যেটা দিয়ে ছাট আসছিল না জলের, খুলে রেখেছিলাম। উলটো দিকে শিবানীদের বাড়ি। শিবানীর মা—লতিকা-কাকিমার

শোবার ঘরের গায়ে শিবানীর ঘর। আমার ঘর থেকে শিবানীর ঘর দেখা যায়—কিন্তু খানিকটা দূর। আমরা আমাদের ঘরে বসে বসে জানলায় দাঁড়িয়ে হাত-টাত নেড়ে হাসি-তামাশা করছিলাম। কখনো কখনো ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলছিলাম, শব্দ বড় একটা পৌঁছচ্ছিল না।

"আমি অনেকক্ষণ ধরে শিবানীকে ডাকছিলাম। ইয়ার্কি করেই। তাকে ইশারা করে বলছিলাম শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলে আসতে। শিবানী আমায় বুড়ো আঙুল দিয়ে কাঁচকলা দেখাচ্ছিল। এইরকম করতে করতে একেবারে সন্ধ্যে হয়ে এল। পেয়ারাগাছের ডালের পাশ দিয়ে শিবানীর ঘরের অনেকটাই চোখে পড়ে আমার। সে আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে জানলায় বসে চুল বেঁধেছে, একটা শাড়িও আলনা থেকে এনে দেখিয়েছে, দূর থেকে রঙটা বুঝতে পারিনি।··· সন্ধ্যের মুখে সব যখন অন্ধকার, আমি নীচে থেকে বাতি আনতে যাব, দরজায় দুমদুম শব্দ। খুলে দেখি শিবানী, হাতে বাতি। সে ওই বৃষ্টির মধ্যে এ বাড়ি চলে এসেছে, নীচে থেকে আসার সময় মা তার হাতে বাতি দিয়ে দিয়েছে। শিবানী এইটুকু আসতেই খানিকটা ভিজে গিয়েছিল; হাত পা মাথা শাড়ির আঁচল বেশ ভিজেছে। লণ্ঠনটা আমার হাতে দিয়ে শিবানী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। জলের ছাট আসছিল। আমি আলনায় ঝুলোনো আমার একটা জামা এনে ওর ভিজে হাত মাথা ঘাড় মুছিয়ে দিতে লাগলাম। ওর মাথার চুল অনেকটা ভিজে গিয়েছিল বলে শিবানী তার লম্বা বিনুনি খুলে ফেলছিল। ওকে আমি আমার পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ভিজে পা দুটি মুছিয়ে দিতে গেলাম, ইয়ার্কি করেই। ও পা দুলোতে লাগল, হাসতে লাগল। শিবানী ততক্ষণে মাথার চুল খুলে ঘাড়ে পিঠে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আমরা লণ্ঠনের আলোয় বসে গল্প করতে লাগলাম। শিবানীর গানের মাস্টার ছিল, সে যে এক সময়ে মোটামুটি ভাল গাইত তা তোমরাও

জানো। শিবানীকে একটা গান গাইতে বললাম। শিবানী যে গানটা গাইল তা আমার এখনো মনে আছে, আমি অনেকবার সে গান শুনেছি, কিন্তু সেদিনের মতন কখনো আর নয়। ঝড়বৃষ্টি, বাইরের দুর্যোগ আর অন্ধকারের মধ্যে আমার ঘরে বসে মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় সে গাইল: 'উতল ধারা বাদল ঝরে···।' ওই গানেরই একটা জায়গায় ছিল, 'ওগো বঁধু, দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে, আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে···।' বার বার শিবানী ওই চরণ দুটি গাইছিল, আর আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু করে হাসছিল। অর্থটা আমি বুঝতে পারছিলাম।···গান শেষ হলে আমরা গল্প করতে লাগলাম। এ-গল্প সে-গল্প। শেষে আমরা ছেলেমানুষের মতন হাতের রেখা, কপালের রেখা, ভাগ্য, ভবিষ্যৎ এইসব কথা নিয়ে মেতে উঠলাম। একে অন্যজনকে সৌভাগ্যের চিহ্ন দেখাতে ব্যস্ত। হঠাৎ শিবানী বলল, তার বুকে নীল শিরার একটা ক্রশ আছে। আমি বললাম, তা হলে সে মস্ত পুণ্যবতী। বলে আমি হাসছিলাম। এরকম যে হয় না, হতে পারে না, তা আমি জানতাম। আমার হাসি দেখে শিবানী বুঝতে পারল আমি তাকে অবিশ্বাস করছি। সে বলল, 'হাসছ কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না?' আমি মাথা নাড়লাম, 'তুমি কি যীশু?'···শিবানীর অভিমানে লাগল। বলল, 'আহা, যীশু না হলে বুঝি কিছু থাকতে পারে না?' আমি তাকে আরো রাগিয়ে দিয়ে বললাম, 'যার কোথাও পাপ নেই তার থাকতে পারে···। মানুষের নয়। যীশুর মতন তুমি মরতে পারবে?'···শিবানী কি ভাবল জানি না, হঠাৎ সে তার বুকের জামার ওপরের বোতাম খুলে—জামা অনেকটা সরিয়ে আমায় বলল, 'আলো এনে দেখ।'··· আমি দেখলাম। কি দেখলাম তা তোমাদের কাছে বলে লাভ নেই।···বুঝতেই পারছ। তবে শিবানীর বুকে শিরা ছিল, নীলচে রঙের। সেটা ক্রশ কি না আমি দেখিনি। আমি অন্য জিনিস দেখেছিলাম।···আজ আমার স্বীকার করতে দোষ নেই, সেই বয়সে

শিবানীর সেই ইনোসেন্স ছিল। আমার হাতে সেটা মরে গেল।”

কমলেন্দু নীরব হলো। তাকে খুব অন্যমনস্ক ও অপরাধীর মতন দেখাচ্ছিল।

নদীর চরের ওপারে রোদ সরে যাচ্ছে, তাপ অনেকটা কমে এসেছে, কোথাও একটা কাক ডাকছিল, গাছেব পাতায় বাতাসে সরসর শব্দ হচ্ছিল। কেমন যেন একটা নিঃঝুম ভাব।

আমরা তিন বন্ধুই নিশ্বাস ফেললাম। কমলেন্দু রুমালে মুখ মুছে নিল।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। “শিশির, তোমার যা বলার···”

আমার বলার পালা কমলেন্দুর পর। শিবানীব জীবনে আমি দ্বিতীয় প্রেমিক, তার যৌবনের প্রেমিক। আমারও তখন যৌবন। আমাদের তখনকার ঘনিষ্ঠতার কথা কমলেন্দুদের অজানা নয়। ওরা যা জানে না, ওদের কাছ থেকে যা আমি গোপন রেখেছিলাম, এবার তা বলার জন্যে আমি তৈরী হলাম। কুলঝোপের মাথা ডিঙিয়ে অপরাহ্ণের রোদ এবং নদী দেখতে দেখতে আমি গলা পরিষ্কার কবে নিয়ে বললাম. “আমি খুব সংক্ষেপে সাবতে চাই।”

“শুনি···” কমলেন্দু বলল।

“বলছি···। তোমাদের কাছে কোনো ভূমিকার দরকার নেই। তবে তোমাদের জানা দরকার যে, তিন-চার বছর শিবানীর সঙ্গে আমার খুব মাখামাখি ছিল, এটা তার শেষের দিকের ঘটনা—” আমি ধীরে ধীরে বললাম। “শিবানীর বাবা তখন মারা গেছেন, লতিকাকাকিমারা তাঁদের নতুন বাড়িতে থাকেন। আমি আমার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্রেনটিসশিপ শেষ কবে পাওয়ার হাউসের চার্জে রয়েছি। শিবানীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তখন এমন অবস্থায় যে, তোমরাও ভাবতে, আমি তাকে বিয়ে করব। লতিকাকাকিমাও ভাবতেন। শিবানীবও তাতে সন্দেহ ছিল না। সন্ধ্যেবেলা ওদের বাড়ি গিয়ে আমাকে তখন বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করতে হতো না,

সোজা ড্রয়িংরুমের পরদা সরিয়ে বাঁদিকের দরজা দিয়ে শিবানীর শোয়ার ঘরে চলে যেতে পারতাম। গল্পগুজব, গানবাজনা, খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন রাত হয়ে গেছে। শিবানী আমায় ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত। আর প্রায় রোজই ফেরার সময়, ফটকের কাছে করবীঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে আমায় চুমু খেত।···শিবানীকে যে দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তা আমার কখনো মনে হয়নি। তার গায়ের রঙ, চোখমুখের ছাঁদ আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু তার শরীর আমার ভীষণ পছন্দ ছিল, তাদের বাড়ির আবহাওয়ায় যে স্বাধীনতা, সপ্রতিভ ভাব, খোলামেলা আচরণ ছিল, তাও আমার খুব পছন্দ ছিল। নতুন ধরনের রুচি, পরিচ্ছন্নতা, বেশবাসের সৌন্দর্য···এ-সবের জন্যে, আর শিবানীর তখনকার শরীরের জন্যে তাকে আমার ভাল লাগত। শিবানীর সেই যৌবন বয়সে তোমরা জানো, মনে হতো তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ফেটে পড়ছে। ···একদিন, সেটা শীতকাল, লতিকাকাকিমা তাঁদের মহিলাসমিতির মিটিঙে গিয়েছিলেন। বাড়িতে চাকর আর ঝি ছিল। ঝি-টার ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করেছে, সে শুয়ে আছে। শিবানীর শোবার ঘরে বসে আমরা গল্প করছিলাম। জানুআরি মাস, প্রচণ্ড শীত। ঘরের জানলা-টানলা সবই বন্ধ ছিল।···সাধারণ একটা কথা নিয়ে আমরা দু'জনেই হাসছিলাম, হাসতে হাসতে শিবানী বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। সে এমনভাবে লুটিয়ে পড়েছিল যে তার একটা হাত মাথার ওপর দিয়ে বালিশে পড়েছে, অন্য হাতটা তার কোমরের কাছে বিছানায় অলসভাবে পড়ে আছে, তার মুখ সিলিংয়ের দিকে, মাথার ওপর হাত থাকার জন্যে তার বুকের একটা পাশ আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে। শিবানীর কোমরের তলা থেকে পা পর্যন্ত বিছানা থেকে মাটিতে ধনুকের মতন বেঁকে—কিংবা বলা ভাল—ঢেউয়ের মতন ভেঙে পড়েছে। বিছানার ওপর সুজনিটা ছিল কালচে-লাল, তাতে গোলাপের মতন নকশা ; শিবানীর পরনের শাড়িটা ছিল সিল্কের, তার রঙ ছিল

সাদাটে। ওর ভাঙা শরীরের বা আছড়ে পড়া শরীরের দিকে তাকিয়ে আমার আত্মসংযম নষ্ট হয়ে গেল।…,ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়ে আমি যখন তার গায়ের পাশে, সে আমায় যেন কেমন করে ফিসফিস গলায় গরম নিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আমি কবে তার মাকে কথাটা বলব।…আমি তখন যে কোনো রকম ধাপ্পা দিতে রাজী। বললাম, কালই বলব, কাল পরশুর মধ্যে। শিবানী যেন অন্ধকারের মধ্যে সুখে আনন্দে উত্তাপে সর্বাঙ্গে গলে যেতে শুরু করল।…সে কতবার করে বলল, সে আমায় ভালবাসে। আমি কতবার করে বললাম, আমি তাকে ভালবাসি।…তারপর ঘরের বাতি জ্বালা হয়ে গেলে আমি শিবানীর ময়লা রঙ, ছোট কপাল, মোটা নাক, সামনের বড় বড় দাঁত, পুরু পুরু ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে পালিয়ে এলাম।… তারপর থেকেই আমি পালিয়েছি…"

আমি থেমে গেলাম। আমার গলার কাছে একটা সীসের ডেলা যেন জমে গিয়েছে। চোখ ফেটে যাচ্ছিল। কী যে অনুশোচনা আজ, কেমন করে বলব!

নদীর ওপারে বনের মাথায় রোদ চলে গেছে। ছায়া পড়ে গেছে নদীর চর জুড়ে। ফাল্গুনের বাতাস দিচ্ছিল। ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে আসতে শুরু করেছে। সমস্ত জায়গাটা অপরাহ্নের বিষণ্নতায় ক্রমশই মলিন হয়ে আসছে।

আমাদের তিন বন্ধুর নিশ্বাস পড়ল।

আমি সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম। মুখ মুছলাম কোঁচায়। তিনজনে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। এবার অনাদির পালা। শিবানীর জীবনে তৃতীয় প্রেমিক। অনাদির দিকে তাকালাম আমরা।

অনাদি প্রায় আধখানা সিগারেট শেষ করল, কোনো কথা বলল না। শেষে মাটির দিকে তাকিয়ে তার কথা শুরু করল :

"শিবানীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা যখন হয়েছে তখন আমরা কেউই

বাচ্চা নেই। আমার বয়স তেত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছিল, শিবানী প্রায় তিরিশ। লতিকামাসিমা তখন আর ঠিক বেঁচে থাকার মতন অবস্থায় নেই, সেই আরথ্রাইটিসের অসুখে পঙ্গু, শয্যাশায়ী। আমি ব্যাংকে অ্যাকাউন্টেন্ট হয়েছি নতুন।···তোমরা ভাই জানো, মহেশ্বরী যখন কনট্রাকটারী ব্যবসায় নামল তখন আমি তার পেছনে ছিলাম, তার সঙ্গে আমার ভেতরে ভেতরে কথা ছিল, তার লাভের একটা পার্সেন্টেজ আমায় দেবে, আমি ব্যাংকে তার সবরকম সুবিধে করে দেব। প্রথম প্রথম মহেশ্বরীর কাছ থেকে বেমক্কা দু' চারশো পেতাম। ব্যাংকে আমি তার সুবিধেটুবিধের মাত্রাও বাড়াতে লাগলাম। মামা ম্যানেজার, যদিও নিজের মামা নয়। মামাকে আমি নানাভাবে ইনফ্লুয়েন্স করতাম। কিন্তু মহেশ্বরী শেষে আমায় ডুবিয়ে দিল। বিশ্রী এক অবস্থায় পড়লাম। ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল যে, আমার পক্ষে কোথাও আর আইনের ফাঁক থাকল না। শিবানীর সঙ্গে আমার তখন মেলামেশা। সত্যি কথা বলতে কি, আমার তখন এমন কাউকে দরকার, যে আমায় অর্থ-সাহায্য করতে পারে। অন্তত একটা জামিন থাকলেও আমার পক্ষে একটু সুবিধে হয়। শিবানীদের নিজের বাড়িঘর, জমি, লতিকা-মাসিমার—আমি তাঁকে মাসিমা বলতাম—কিছু টাকা এবং অলংকার ছিল। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শিবানীদের শরণাপন্ন হবার কথা ভাবছিলাম। লতিকামাসিমা মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তিই শিবানীর হবে। তাছাড়া, লতিকামাসিমা বেঁচে থাকতেও যদি শিবানীর সঙ্গে আমার তেমন একটা সম্পর্ক দেখতে পান, তিনি আমায় বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে পারেন।···বেশি বলে লাভ নেই, আমি শিবানীর সঙ্গে যে-ধরনের সম্পর্ক পাতালাম—তাতে মনে হবে আমরা যেন স্বামী-স্ত্রী। আমি শিবানীর অঙ্গ স্পর্শ করিনি—মানে সেভাবে নয়, আমার তাতে আগ্রহ ছিল না। অথচ আমি শিবানীদের বাড়িতে সারাদিনও থেকেছি। তাদের বাড়িতে থেকেছি, খেয়েছি, বিছানায়

শুয়েছি, লতিকামাসিমার জন্যে ডাক্তার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছি, শিবানীর ও তাদের সংসারের তদারকি করেছি।···আমার ওপর লতিকামাসিমার সুনজর পড়ল, শিবানী প্রথম প্রথম আমায় কি ভাবত জানি না, পরে সে আমার ওপর নির্ভর ও বিশ্বাস করতে লাগল। তখন চাকরিতে আমার গণ্ডগোল বেধে গেছে, মামার জোরে তখনো জেলে যাইনি, কিন্তু মহেশ্বরীকে মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। শরীর খারাপের অজুহাতে আমি ছুটি নিয়েছি, পুজোর মুখে। আমার বাড়ি বলতে এক মা, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুলেই দিয়েছিলাম। ছুটি নিয়ে শিবানীদের বাড়িতে পড়ে আছি। দুশ্চিন্তায় খাওয়া নেই, ঘুম নেই, চোখমুখ শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেছে। এমন সময় একদিন বিকেল থেকে লতিকামাসির খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা হলো। ডাক্তার ডেকে আনলাম, ওষুধপত্র চলতে লাগল নতুন করে।···সেদিন সন্ধ্যের পর লতিকামাসির অবস্থা যখন একটু ভাল হলো, আমি বাইরে—শিবানীদের বাড়ির বাগানে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, অন্ধকারে। এমন সময় কখন শিবানী পাশে এসে দাঁড়াল। দু' চারটে কথার পর সে বলল, আমি আর কতদিন এভাবে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা নিয়ে বসে থাকব?···আমি তখন জামিন এবং টাকার কথা বললাম। শিবানী কিছু না ভেবেই বলল, লতিকামাসির কাছে সে সব বলবে।···আমরা দু'জনেই তখন একটা শিউলিগাছের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, অনেক দিন পরে হঠাৎ আমার নাকে শিউলিফুলের গন্ধ লাগল। আমি শিবানীর হাত টেনে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার সেই কান্না কুকুরের মতন। শিবানী আমায় সান্ত্বনা দিল। পরে বলল, 'এই ঘরবাড়ি, টাকা—এ-সব মা আমার ভবিষ্যৎ ভেবে রেখেছে। যার কাছে আমার আশ্রয় জুটবে, এ-সবই তার। তুমি তো এ-সবই তোমাব নিজের ভাবতে পার।'···আমি সেরাত্রে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।···লতিকামাসিমা আমার তরফে জামিন দাঁড়ালেন. কিছু টাকাও আমায় তিনি দিয়েছিলেন। শেষ

পর্যন্ত মহেশ্বরী মামলায় এমন এক অবস্থায় পড়ল যে তাকে সরিয়ে রাখা টাকা বের করে দিতে হলো। আমার গণ্ডগোলটাও মিটে গেল। লতিকামাসি অবশ্য আরো মাস কয়েক বেঁচে ছিলেন। কিন্তু শিবানী ভবিষ্যতের জন্যে আমার ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিল; সে-ভার আমি নিইনি, তাকে আশ্রয়ও দিইনি। শিবানীকে ঠিক বিয়ে করার মতন মেয়ে আমার কোনোদিনই মনে হয়নি।…”

অনাদি চুপ করল।

আমরা চুপচাপ। নিঃসাড় যেন। একটা সাদা ধবধবে বক নদীর ওপর দিয়ে গোধূলির আলোর সীমানা পেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

কমলেন্দু বলল, “লতিকাকাকিমার টাকাটা তুমি ফেরত দাওনি ?”

“পরে মাসিমা মারা যাবার পর শিবানীকে কিছুটা দিতে গিয়েছিলাম, ও নেয়নি।”

আর কোনো কথা হলো না। আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু, শিবানীর তিন প্রেমিকপুরুষ নীরবে বসে থাকলাম, কেউ কারো দিকে তাকালাম না। বসে বসে কখন যেন দেখলাম, আকাশ বন নদী জুড়ে আসন্ন সন্ধ্যাব ছায়া। আমাদের চারপাশে সেই সীসের মতন ছায়া ক্রমশই জমতে লাগল। আমাদের নাম ধরে চিতার কাছ থেকে ওরা তখন ডাকছে।

দাহ শেষ। চিতা ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেলেগুলোর জল ঢালা ফুরোলো। এবার আমরা। নদী থেকে মাটির কলসিতে জল ভরে এনে কমলেন্দু শিবানীর ভিজে চিতায় জল ঢেলে দিল। তারপর আমি। কমলেন্দুর হাত থেকে কলসি নিয়ে নদী থেকে জল ভরে আনলাম। এনে শিবানীর চিতায়, তার নিশ্চিহ্ন শবীরের ছাইয়ের রাশিতে জল ঢাললাম। তারপর অনাদি জল দিল। শেষে ভুবন।

কলসিটা ভেঙে দিয়ে ভুবন ফিরল। আমরা কেউ আর পিছু ফিরে তাকাব না।

আমরা এগিয়ে চলেছি। ওরা—পুরুতমশাই আর ছেলেরা আমাদের আগে আগে, গরুর গাড়িটা চলছে, চাকার করুণ শব্দ, আমরা চার বন্ধু পাশাপাশি। ভুবনকে আমাদের পাশে পাশে হেঁটে যেতে দেখে আমাদের অস্বস্তি হচ্ছিল। ও বড় ক্লান্ত, অবসন্ন। মনে হলো যেন ঠিক মতন পা ফেলতে পারছে না। আমরা তাকে গরুর গাড়ির ওপর বসিয়ে দিলাম জোর করে। সে আমাদের দিকে মুখ করে গরুর গাড়িতে বসে থাকল, উদাস দৃষ্টিতে।

এমন সময় চাঁদ উঠে গেল। শুক্লপক্ষ, আজ বুঝি ত্রয়োদশী।

নদী পিছনে, দু' পাশের জঙ্গল গুটোনো পাখার মতন দু' পাশে নেমে গেছে, সামনে উঁচু-নীচু কাঁচা রাস্তা। জ্যোৎস্না ধরেছে বনে, ঝিল্লিরব ঘন হয়ে এল, ফাল্গুনেব বাতাস বইছে, গরুর গাড়ির চিকন করুণ শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই, আর আমাদের পায়ের শব্দ। মাথার ওপর চাদ।

যেতে যেতে কমলেন্দু হঠাৎ বলল ভারী গলায়, "শিবানীর চিতায় জল ঢালার সময় কেমন যেন কান্না এসে গিয়েছিল। আহা, বেচারী।...ভাই, আমি আজ তার কাছে, তার চিতায় জল দেবার সময়, মনে মনে ক্ষমা চেয়েছি।"

আমিও তো শিবানীর চিতায় কলসি করে জল ঢালার সময় আমার পাপের জন্যে মার্জনা চেয়েছিলাম। অস্ফুট গলায় আমি বললাম, "আমিও ক্ষমা চেয়েছি।"

অনাদি যে কাঁদছিল আমরা খেয়াল করিনি। সে ছেলেমানুষের মতন মুখে কান্না ও লালা জড়িয়ে বলল, "আমিও..."

চাঁদের আলোয আমরা তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিন প্রেমিক চলেছি। আমাদের সামনে ভুবন। পিছনে শ্মশান, শিবানীর ধুয়ে যাওয়া চিতা।

যেতে যেতে সামনে ভুবনের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম, আমরা তিনজনে—তিন প্রেমিক শিবানীর নিষ্পাপতা, কৌমার্য,

নির্ভরতা তো হরণ করে নিয়েছিলাম। নিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু তারপরও আর কি অবশিষ্ট ছিল শিবানীর, যা ভুবন পেয়েছে! কি পেয়েছে ভুবন যার জন্যে তার এত ব্যথা?

চাঁদের আলোয় ভুবনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। তার চার পাশে নিবিড় ও নীলাভ, স্তব্ধ, মগ্ন যে চরাচর তা ক্রমশই যেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে এক অলৌকিক বিষণ্ণ ভুবন সৃষ্টি করছিল। এ যেন আমাদের ভুবন নয়। অথচ আমাদেরই ভুবন।
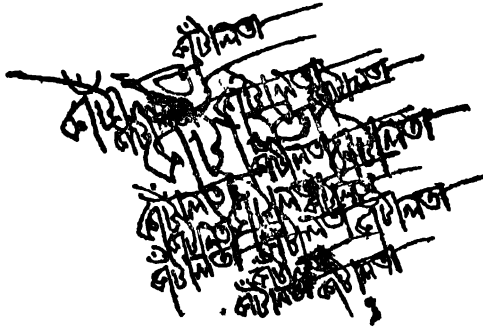
কাঁটালতা / আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

রেণুকুটে আমাদেব একটা বাড়ি ছিল পৈতৃক বাড়ি। বাবা ছিলেন সরকারী ডাক্তার, কর্মজীবনে বিহার-প্রবাসী। ছোট-নাগপুরেব জল-হাওয়ায় থাকতে থাকতে সেখানকার জল-বাতাস তাঁর মনে ধরে গিয়েছিল ; পাহাড় জঙ্গল মাঠ আর শুকনো আবহাওয়া তিনি পছন্দ করতেন। চাকরি থেকে অবসর নেবাব পর রেণুকুটে তিনি বাংলো ধরনের একটা বাড়ি করেন, বেশ বড় বাড়ি ; ফল-ফুলের বাগান করেন ; আর জলের দরে অনেকটা মাঠ-জঙ্গল কিনে রাখেন। বাবার অবশিষ্ট জীবন রেণুকুটেই কাটে। বাবা মাবা যাবার পর মা জায়গা-নাড়া করেনি। চাকর-বাকর আর প্রতিবেশীদের ভরসায় মা বছর চারেক আবো বেঁচে ছিল, তাবপর মারা যায়। আমরা দু' ভাই, এক বোন। দাদা আব আমি খানিকটা রাঁচি বাকিটা পাটনায় মানুষ, দিদি রাঁচিতে। দাদা পাটনা থেকে লেখাপড়া শেষ করে সরকারী কাজ নিয়ে নাগপুরের দিকে চলে যায় ; আমি বাংলা দেশে। দিদির বিয়ে হয়েছিল কাশীতে।

মা মারা যাবার পর রেণুকুটের বাড়ি, বাগান, জঙ্গল বিক্রী করে দেবার কথা আমাদের মধ্যে উঠেছিল। বিষয়টা নিয়ে পরে কেউ ভাবিনি। তিনজনে তিন জায়গায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলাম যে, চিঠিপত্রেই আমাদের যোগাযোগটা রাখতে হতো ; দেখা-সাক্ষাৎ বড় হতো না। মাঝে মাঝে চিঠিতে বাড়ি-টাড়ি বেচার কথা উঠত ; কিন্তু ওই—কথাটা উঠতই শুধু, আমরা তেমন গা বা গরজ করতাম না। আট-দশ বছর এইভাবে কেটে গেল, শেষে শুনলাম আমাদের রেণুকুটের বাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বাগান জঙ্গল হয়ে গেছে, আর জঙ্গলের নানা জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে। দাদার কিছু বাড়তি টাকার দরকার ছিল, মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছে ; আমিও বংলাদেশে একটু জমি-জায়গা কেনার কথা ভাবছিলাম ; রেণুকুটের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রায় ছিলই না আর, কাজেই পৈতৃক সম্পত্তি এবার বেচে দেবার কথা স্থির করে আমরা রেণুকুটে এলাম। রেণুকুটে বাবার বন্ধু মহাদেবপ্রসাদের ছেলে জগদীশবাবু ছিলেন। তিনিই আমাদের তরফে বেচাবেচির কথাবার্তা বলছিলেন। জগদীশবাবুর চিঠি পেয়ে আমরা রেণুকুটে হাজির হলাম। দাদা এল ছিঁদোয়াড়া থেকে, আমি কলকাতা থেকে। আর দিদি-জামাইবাবুকে কাশী থেকে আনালাম।

মা মারা যাবার পর আমরা এক-আধবার রেণুকুটে গিয়েছি, তারপর আর যাওয়া হয়নি। অনেককাল পরে যাচ্ছি বলে আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম, শীতেই যখন যাচ্ছি তখন সপরিবারে সকলে যাব, মাসখানেক থাকব, তাতে বেড়ানো, স্বাস্থ্যোদ্ধার, পারিবারিক দেখাসাক্ষাৎ এবং কাজের কাজ সবই হয়ে যাবে। আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে শেষবারের মতন দেখে আসুক—এ-রকম একটা ইচ্ছেও আমাদের ছিল।

আমাদের পারিবারিক সদ্ভাব ছিল। দূরে দূরে থাকার দরুন পরস্পরকে আমরা দেখার আকাঙ্ক্ষা করতাম, ভালবাসতাম। দাদা এবং আমার মধ্যে বাল্যকাল থেকেই সৌহার্দ্য ছিল, আমরা বছর

চারেকের ব্যবধানে জন্মেছি, মাঝখানে ছিল দিদি, তুই ভাইয়ের মধ্যে সাঁকোর মতন একটু বৈচিত্র্য বোধ হয়। ছেলেবেলায় আমরা ছড়া করে দিদিকে বলতাম : 'তু' দিকে তুই লাট মধ্যিখানে মাঠ' ; দিদি ওটা উলটে দিয়ে কলা দেখিয়ে বলত : 'তু' দিকে তুই মাঠ, মধ্যিখানে লাট।'…তা দিদি আমাদের লাটই ছিল, অন্তত লাটসাহেবের মেজাজ পেয়েছিল। আদরে আদরে বোধ হয়। আমরা লাটানীকে খুব ভালবাসতাম।

রেণুকুটের বাড়ি আর সম্পত্তি বেচবার সময় দিদিকে আনানোর একটা কারণ ছিল। দাদা আর আমার মধ্যে এই যে পৈতৃক সম্পত্তি সমানভাগে ভাগ-বাটরা হবে, তাতে দিদি আমাদের ধর্মতঃ সাক্ষী থাকবে। আমরা তু' ভাই কেউ কাউকে কিছু বলতে পারব না, বলব না ; দিদি আমাদের তু' তরফ দেখে যাকে যা করতে বা নিতে বা দিতে বলবে, আমরা তাই করব। অবশ্য আমরা চেয়েছিলাম দিদি আমাদের কাছ থেকে কিছু নিক। কিন্তু দিদি তা নেবে না। জামাইবাবুরা খুবই সচ্ছল পরিবারের লোক, দিদি আমাদের তু' ভাইকে সব দিতে চায়, দিয়ে তৃপ্তি পেতে চায়।

বেণুকুটের পুবনো বাড়ি ঝাড়া-মোছা করে, আমবা তু' ভাই এবং বোন যখন সপরিবারে গুছিয়ে বসলাম তখন বাড়িটা গমগম করতে লাগল। পৌষ মাস, প্রচণ্ড শীত, খটখটে শুকনো মাঠঘাট জঙ্গল, গাঢ় স্থন্দর তপ্ত রোদ, মিষ্টি জল, বাড়িভরা ছেলেমেযের দল, গিন্নীরা তু'জন, দিদি—এতগুলো লোকের একত্র হওয়ায় যেরকম হই-হই হাসি-হুল্লোড়, দলবেঁধে বেড়ানো, আড্ডা, গল্পগুজব চলছিল, তা দেখেশুনে মনেই হবে না, আমরা বৈষয়িক কারণে রেণুকুটে এসেছি ; বরং ধারণা হবে, শীতের ছুটি কাটাতে সমস্ত পরিবার একত্র হয়েছি। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সেইভাবে দিন কাটাচ্ছিল, গিন্নীরাও ; আমরা জগদীশবাবুর সঙ্গে সম্পত্তি বিক্রির পাঁচ রকম ঝকমারি কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

দেখতে দেখতে পৌষ মাস শেষ হয়ে এল। আমাদের হাতের কাজও মিটে এসেছিল। উকিলবাড়িতে দলিল তৈরী হচ্ছিল, মাঘের প্রথম দিকেই কোর্ট-কাছারি করে বাকিটুকু শেষ হবে। হাতে আর আমাদের কাজকর্ম ছিল না, দুশ্চিন্তা উদ্বেগ ছিল না, সোলার টুপি মাথায় পরে লোক দিয়ে জঙ্গল মাপামাপির ঝঞ্ঝাটও আর পোয়াতে হচ্ছিল না। এতদিন আমরা দু' ভাই, কখনো-সখনো দিদিও, কাজকর্ম ও প্রয়োজনীয় কথাবার্তার জন্যে অন্যদের সঙ্গে তেমন ভাবে মিশতে পারছিলাম না। এবার সে অবসর হলো।

অবসর হলে দাদাই বলল, "চল্ রে, একদিন আমাদের জঙ্গলে গিয়ে সারা দিন কাটিয়ে আসি। এই তো শেষ।"

ছেলেমেয়ের দল কাছে বসে তাস খেলছিল, স্ক্রু না কি যেন; গোপা একটা বই পড়ছিল; জামাইবাবু বসে বসে সিগারেট পাকাচ্ছিল; দাদার কথায় সকলেই কান দিল, দিয়ে তাকাল।

সোনা বলল, "পিকনিক না এমনি বেড়ানো?"

দাদা হেসে জবাব দিল, "সারাদিন কাটাতে হলে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না! হাঁড়িকুড়ি চাল-ডাল বেঁধেই যাব।"

গোপা বলল, "কিসে যাব বাবা?"

"হেঁটে", দাদা বলল, "আমাদের জঙ্গল তো সামনের ওই মাঠ থেকে শুরু, তবে যেখানে যাব সেটা একেবারে জঙ্গলের শেষ। হেঁটেই যাওয়া যাবে।"

সোনা বলল, "জেঠামণির যেমন কথা, হেঁটে হেঁটেই যদি যাওয়া, তবে বাপু, হাঁড়িকুড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়া কেন! বাড়ি থেকে খেয়ে বেরুলেই হয়।"

বড় খোকা, মানে দাদার ছেলে বলল, "তোর খালি স্টমাকের ফিকির। তুই বাড়ি থেকে লোডেড হয়ে যাস; আমরা জঙ্গলেই উনুন জ্বালব।"

সোনা জবাবে জিব ভেঙিয়ে বলল, "থাম তুই, উনুন জ্বালব! উনুন কি, তুই তো চুল্‌হা বলবি।"

বড় খোকা আর সোনায় বেধে গেল। সব সময়েই বাধছে। একেবারে সমবয়সী।

জ্যোতিদা, মানে জামাইবাবু বলল, "কথাটা মন্দ বলোনি বড়দা, চলো বুড়ো বয়সে একবার চড়ুইভাতি করে আসি।...আমার বিয়ের পর একবার গিয়েছিলাম সব, মনে আছে? তুমি ফক্স আর টাইগারের মধ্যে গোলমাল করে ফেলেছিলে..." বলতে বলতে জ্যোতিদা হো-হো করে হাসল। দাদা আর আমিও হেসে উঠলাম। ভাগ্নে রবি বসে ছিল, সে এবং আমাদের ছেলেমেয়েরাও হাসতে লাগল।

জ্যোতিদা ঠাট্টা করে দাদাকে বড়দা আর আমাকে ছোড়দা বলে ডাকে; নয়তো দাদাকে নাম ধরেই ডাকে—বসন্ত। আর আমাকে প্রশান্ত বলে ডাকার অধিকার তো তার আছেই। হাসাহাসির মধ্যেই জ্যোতিদা বলল, "ব্যবস্থাটা তাহলে তোমাদের লাটানীকেই পাকা করতে বলি। গোপা, তোমার পিসিমাকে ডাকো।"

দিদির নাম সুনয়নী। আমরা ছেলেবেলায় তার লাটসাহেবী মেজাজের জন্যে বলতাম—লাটানী; সেই নাম তার এখনো জ্যোতিদার মুখে মাঝে মাঝে শোনা যায়।

গোপা গিয়ে দিদিকে ধরে আনল।

জ্যোতিদা জঙ্গলে চড়ুইভাতি করতে যাবার কথাটা গুছিয়ে বলল দিদিকে; তারপর হেসে বলল, "লাটানী, এই হলো আমাদের লাস্ট পিকনিক টুগেদার।...চলো সমবেত হওয়া যাক। সমবেতা যুযুৎসবঃ—"

আমি হেসে বললাম, "যুযুৎসবঃটা কি জ্যোতিদা?"

জ্যোতিদা পাকানো সিগারেট ঠোঁটে ঠেকিয়ে আগুন জ্বালল।

২

পরের দিন একটু বেলায় বেশ বড়সড় একটি দল করে আমরা বেরুলাম। দাদা বউদিরা পাঁচজন—কর্তাগিন্নী আর তিন ছেলেমেয়ে; আমরা চার—আমি আর নীহার বাদে দুই ছেলেমেয়ে; দিদিরাও চার—দিদি জ্যোতিদা আর দুই ছেলে। চাকর আর পাঁড়ে ছিল। জগদীশবাবু একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; সেই গাড়িতে উনুন, কাঠ, চাল-ডাল, তরিতরকারি আর দু' কলসী জল চাপিয়ে চাকর আর পাঁড়ে চলে গেল, তাদের সঙ্গে থাকল বড় খোকা আর পূর্ণ।

দাদা মোটামুটি একটা জায়গার কথা বলে দিয়েছিল, বলেছিল, শাল জঙ্গলের পর দেখবি পশ্চিম ঘেঁষে একটা বালিয়াড়ির মতন আছে, সেখানে বেশ ছায়াটায়া দেখে জায়গা বেছে নিবি। তোরা জিনিসপত্র নামাতে নামাতে আমরা চলে আসব।

আমরা বেশ চড়া রোদেই বেরুলাম; পৌষের রোদ এত গাঢ় ও তপ্ত যে সকাল ফুরোবার আগেই মাঠঘাট থেকে হিম শিশির কুয়াশা শুকিয়ে সব খটখটে হয়ে যায়। আমাদের বেরুতে বেরুতে প্রায় দশটা বেজে গিয়েছিল, রোদ তখন মস্ত একটা ফুলঝুরির মতন যেন জ্বলছে চারপাশে, চোখে সামান্য লাগছিল। তবু পৌষের বাতাস আর শীতের দরুন রোদটা আরামদায়ক লাগছিল। খানিকটা পরে আমাদের—বুড়োদের ছাতা খুলতে হলো, না হয় সোলার টুপি পরে নিতে হলো। ছেলেমেয়েদের এসবে ভ্রূক্ষেপ ছিল না; তারা অনেকটা আগে আগে চলছিল এবং থেকে থেকে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছিল।

দাদা, জ্যোতিদা আর আমি আগে আগে, পেছনে বউদি, দিদি আর নীহার। দাদা মাথায় সোলার টুপি পরেছিল, আমি আর জ্যোতিদা ছাতার তলায় মাথা ঢেকে চলেছি। পেছনে দুটো ছাতার তলায় বউদি, দিদি আর নীহার।

যেতে যেতে দাদা ছেলেবেলার নানান গল্প বলছিল, আমার কিছু কিছু মনে পড়ছিল, কিছু বা পড়ছিল না। মাঝে মাঝে দিদির ডাক পড়ছিল। দাদা নিজের স্মৃতিশক্তির সঙ্গে দিদির স্মৃতি মিলিয়ে নিচ্ছিল। দেখলাম, আমাদের মধ্যে দাদারই স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর ; তার ছোটখাটো তুচ্ছ অনেক ঘটনাই মনে আছে।

দাদা প্রায় একাই গল্পে গল্পে আমাদেব নীরব রেখে অনেকটা পথ এগিয়ে নিয়ে এল। মাঠ বা উঁচুনীচু কাঁকর ছড়ানো প্রান্তর, কিছু সবুজ ক্ষেতখামার ছাড়িয়ে শেষে আমরা জঙ্গলে এসে পড়লাম। জঙ্গলের এদিকটায় নিম আর গরগলের ঝোপটাই বেশী, কিছু কাঁঠাল গাছ। বনের মাথায় গাছপালার চাঁদোয়ার জন্যে রোদটা আর তেমন মাথায় বা চোখে লাগছিল না। আমরা ছাতা বন্ধ করে ফেললাম। মেয়েরাও।

একই সঙ্গে, দু' হাত হয়তো আগুপিছু হবে, আমরা আর মেয়েরা হাঁটছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে জ্যোতিদা বলল, "বসন্ত, সেই কুয়াটা কোথায় ?"

"কোন কুয়া ?" দাদা জিজ্ঞেস করল, "কুয়া একটা শাল জঙ্গলে আছে।"

"আরে না, সে কুয়া নয় ; আর-একটা কুয়া ছিল শুনেছি—শ্বশুর-মশাই বুজিয়ে ফেলেছিলেন।"

দিদি ঠাট্টা করে বলল, "সর্বনাশ, সে কুয়ার কথা তোমার এখনো মনে আছে !"

জ্যোতিদা হেসে জবাব দিল, "থাকবে না ; তুমি ওই কুয়ার মধ্যে ঝাঁপ খেতে গিয়েছিলে !"

দিদি বলল, "থাক, বুড়ো বয়সে আর রঙ্গ করো না।"

বউদি হেসে বলল, "ঠাকুরঝি ঝাঁপ খেতে যাবার আগেই তো আপনি দড়িদড়া নিয়ে গিয়ে বসেছিলেন ঠাকুরজামাই, তাই না ?"

জ্যোতিদা জবাবে হেসে হেসে বলল, "আপনি একটু ভুল

শুনেছেন, আমি দড়িদড়া নিয়ে যাব কেন, নিজেই গিয়ে কুয়ার তলায় বসেছিলাম।”

নীহার খিল খিল করে হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিল। বউদি আর দিদিও হাসছিল।

জঙ্গলের মধ্যে পাখিরা যে কোথায় ডাকছে বোঝা যায় না। চিক্ চিক্ চিকির শব্দ উঠছিল, কখনো কখনো চিকন শিসের মতন কিছু ডাকছিল, মাথার ওপর পলকা ডালের পাতা নড়ছিল, আমাদের পায়ের তলায় শীতের শুকনো পাতা। ডালপালার আড়াল দিয়ে রোদ এসে চমৎকার ঝাফরি করে রেখেছিল। আমরা পরম আলস্যে গল্প করতে করতে হাঁটছিলাম।

বউদি বলল, “বিয়ের পর আমার জঙ্গল দেখা হয়নি ; এই প্রথম এই শেষ।”

নীহার বলল, “আমারও।”

জ্যোতিদা বলল, “শ্বশুরের ভিটেতে ছেলের বউরা তো আর থাকল না, থাকলে দেখত!”

বউদি জবাবে বলল, “সে দোষ বউদের না ছেলেদের? তুমিই বলো ঠাকুরঝি?”

দিদি বলল, “দোষ কারো নয়, সবই আমাদের কপাল।”

নীহার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, তার গায়ের শালের সঙ্গে একটা কাঁটালতা জড়িয়ে গিয়েছিল। এরকম কাঁটাগাছ সচরাচর চোখে পড়ে না। শুকনো মরা হরিতকী গাছের গা বেয়ে বেয়ে গাছটা উঠেছিল। দেখলেই বোঝা যায়, কাঁটালতা জড়িয়ে জড়িয়ে মস্ত একটা কাঁটাগাছ তৈরি হয়ে গিয়েছে—বড় বড় পাতা আর বাবলা কাঁটার মতন কাঁটা। অনেকটা ঢেকে ফেলেছিল, প্রায় রাস্তা জুড়ে লতায় পাতায় ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গাছ থেকে গাছে। নীহার সামান্য অসাবধান হয়েছিল, তার শাল কাঁটালতায় আটকে গেল।

নীহার দাঁড়াল। বউদি বলল, "দাঁড়া, নড়িস না, খুলে দিচ্ছি।" ছোট জাকে বউদি তুই বলত। এটা পুরনো অভ্যেস।

বউদি পারল না। নীহারের গায়ের শালটায় চওড়া করে কাজ ছিল, কাশ্মীরী কাজ; এমন বেয়াড়াভাবে ঝুলন্ত কাঁটালতার একটা ডগা নকশার সুতোর সঙ্গে আটকে গিয়েছিল যে, খোলবার চেষ্টা করে বউদি আরো যেন জড়িয়ে ফেলল। তারপর অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "দূর ছাই, এ যে বিদকুটে কাঁটা বাপু, আরো গণ্ডগোল হয়ে গেল। কই ঠাকুরঝি, তুমি দেখো।"

দিদি খুব সাবধানে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে কাঁটা ছাড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। নীহার প্রথমেই বোধ হয় গণ্ডগোল করে ফেলেছিল।

শেষে জ্যোতিদাই কাঁটাটা ছাড়িয়ে দিল।

কাঁটা ছাড়ানো হয়ে গেলে নীহার বলল, "বাব্বা, এরকম কাঁটাগাছ থাকলে জঙ্গলে হাঁটাই মুশকিল।"

আমরা আবার ঝোপ-জঙ্গলেব বাইরে ফাঁকায় এসে পড়েছিলাম। আমলকির চারা চারপাশে, কিছু তেঁতুল ঝোপ; কালো কালো কটা পাথর; সামনে ঢালু জমি নেমে গেছে, দূরে আমাদের ছেলেমেয়েদের দেখা গেল, রোদেব মধ্যে দিয়ে চলছে।—ওরা অন্যপথে এসেছে।

জ্যোতিদা পথের মধ্যে দাঁড়াল হঠাৎ, কালো কালো পাথর-গুলো দেখল, এদিক ওদিক তাকাল। তারপর বলল, "আমার মনে হচ্ছে বসন্ত, সেই কুয়াটা এখানেই ছিল।"

দাদা এদিক ওদিক তাকাল, বলল, "হতে পারে। এই পাথর-গুলো দেখে আমারও মনে হচ্ছে এদিকে কোথাও ছিল।"

বউদি ঠাট্টা করে বলল, "ঠাকুবজামাই যে কুয়াটাব কথা ভুলতে পারছেন না!"

"কি করে ভুলি বলুন," জ্যোতিদা জবাব দিল, "বিয়ের পর আপনার ঠাকুরঝি ওই কুয়ার জন্যে আমায় কতকাল যে ঘুমোতে দেয়নি!"

দিদি জোতিদাকে ভৎর্সনা করে বলল, "বাজে কথা বলো না; তাড়াতাড়ি চলো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কুয়া খুঁজতে হবে না এখন। কত বেলা হয়েছে খেয়াল করেছ!"

জ্যোতিদা হাসল।

যেতে যেতে আমি বললাম, "জ্যাতিদা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, কুয়াটা বোজাবার পর চারপাশে কাঁটা ফেলা হয়েছিল, ওই কাঁটালতার ঝোপ বোধ হয় সেই থেকে। ···এখন আর কুয়াটা দেখা যাবে না।"

দেখার কথাটা অবশ্য এখানে অবান্তর ছিল। কবে একটা জঙ্গলের কাঁচা কুয়া বোজানো হয়ে গেছে, এতদিনে তা দেখা সম্ভবও নয়, ঘাসপাতা বুনো লতায় এখন কুয়ার মুখ জঙ্গল, বোঝাও যাবে না এখানে কিছু ছিল।

নীহার বলল, "এত জায়গা থাকতে এই জঙ্গলের মধ্যে কুয়া কেন?"

"বাবার খেয়াল", দিদি জবাব দিল।

দাদা বলল, "বাবার মাথায় মাঝে মাঝে উদ্ভট সব খেয়াল চাপত। লোকে দশটা সৎ পরামর্শ দিলেই যে বাবা সেই পরামর্শ মতন কাজ করতেন এমন নয়, কিন্তু কেউ যদি অসম্ভব একট কথা বলত, বাবা অমনি সেটা সম্ভব করতে বসতেন। শুনেছি, কে নাকি বলেছিল—অতটা জঙ্গল ফেলে না রেখে খানিকটা জমি করে নিতে। তা বাবা, সামনের কয়েক বিঘে জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে ক্ষেতখামার করতে বসেছিলেন। কুয়া খুঁড়িয়ে ছিলেন জলের জন্যে, একটা চালাও তুলেছিলেন। মাথায় খোলার চাল। সবই গেছে। জঙ্গলে আমি কিছু ঢেঁড়স গাছ ছাড়া আর কিছু হতে দেখিনি।"

"অনেক পেঁপে গাছ হয়েছিল", আমি বললাম।

দাদা মাথা নাড়ল।

বউদি হেসে বলল, "ঠাকুরজামাই কি বিয়ের পর নতুন কিছু দেখেছিলেন?"

জ্যোতিদা হাসল। সিগারেটটা নতুন করে জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, "নতুন আর কি দেখব, ওরা যা দেখেছে আমিও তাই, সামান্য হয়তো বেশী। কিন্তু সেকথা থাক।…ফেরার সময় বিকেল হয়ে যাবে, খুব সাবধানে ফিরতে হবে, কাঁটায় না আমাদের জড়িয়ে ধরে।"

জ্যোতিদা যে কি ভেবে কথাটা বলল আমরা বুঝলাম না। দিদি যেন বিরক্ত হয়ে জ্যোতিদাকে একটা ধমকই দিল, "তুমি কি বউদিকে ভূতের ভয় দেখাচ্ছ নাকি ?"

জ্যোতিদা হাসল। "আরে না, না ; ভূতের ভয় দেখাব কেন! ওই কাঁটা তোমারও লাগতে পারে, আমারও পারে ; বসন্তের পারে, প্রশান্তরও পারে।"

ততক্ষণে আমরা সামনে শাল জঙ্গলটা দেখতে পেয়ে গেছি।

৩

পূর্ণরা জায়গাটা ভালই বেছে ছিল। শাল জঙ্গলেব শেষে বালিয়াড়ির কাছেই। ওটা ঠিক বালিয়াড়ি নয়, খানিকটা তফাতে যে চাঁচি-পাহাড়, তারই একটা ভাঙা ঢেউ এসে এ-পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। বুনো গাছে ভর্তি, আর পাথরের রাশি। ওপাশটায় বালিয়াড়ির দক্ষিণে পাহাড়ী নদীর একটা ধারা, বালি আর পাথরের চাঁই, মাঝমধ্যিখান দিয়ে জলের যেন ফিতে পড়ে আছে। জায়গাটা খুবই মনোরম।

গাছের ছায়ায় উনুন ধরিয়ে দিয়ে পূর্ণরা চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের আসতে একটু সময় লাগলেও ছেলেমেয়েদের লাগেনি। তারা নিশ্চয় সোজাসুজি এসেছে, পথ ধরে নয়, আমরা একটু ঘুর-পথে। ওরা খানাখন্দ ডিঙোতে পারে, মাঠঘাট ভাঙতে পারে, আমরা পারি না। দাদার বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, দিদি পঞ্চাশ ধরছে প্রায়, আর আমার আটচল্লিশ। জ্যোতিদা দাদার চেয়ে দু-চার বছরের বড়ই। স্বাস্থ্য জ্যোতিদারই সবচেয়ে ভাল,

দাদারও খারাপ নয়। তবে দাদার মাথায় বিরাট টাক পড়ে গিয়ে আর দাঁত নড়ে দাদাকে বেশ বুড়ো করে দিয়েছে। জ্যোতিদা লম্বা হলেও চওড়া নয়, ছিপছিপে। স্বাস্থ্য আমারই সবচেয়ে খারাপ, আধিব্যাধিতে নিত্যই ভুগছি। বউদির চেহারা মোটাসোটা, মাথার চুলে সাদাটে ছোঁয়া লেগেছে, চোখমুখে, আজও লক্ষ্মীশ্রী লেগে আছে; দিদির চেহারা তো এখনো চোখ চেয়ে দেখার মতন; যেমন পরিষ্কার কাটাকাটা ছাঁদ নাক-চোখ-মুখের, তেমনি মাথায় লম্বা, গায়ে মাঝারি। দিদির গায়ের রঙ গুললে বোধ হয় এখনো ধবধবে জল বেরুবে। নীহার সুন্দরী নয়, কিন্তু সুশ্রী; চেহারা না হোক, গাল মুখ বেশ ফুলিয়ে ফেলে তার বয়েসকে চল্লিশের ওপরে এনে দাঁড় করিয়েছে। গলার স্বর এখনো মিষ্টি। আমার মেয়ে সোনার গলা আর নীহারের গলা চিনতে আমারই মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়।

ছায়ায় বিছোনো সতরঞ্জির ওপর বসে বসে আমাদের চা খাওয়া হলো। বেলা যথেষ্ট হয়েছে। দিদি বউদি সামান্য জিরিয়ে নিয়েই পাঁড়েকে নিয়ে রান্নায় বসল; নীহার গোপাকে নিয়ে তরিতরকারি কুটতে বসল জামতলায়।

ছেলেমেয়েরা পিসি, জেঠি, কাকিদের কাজে হাত লাগাল খানিক, খানিক অকাজ করল; বড় খোকা আর-একটা উনুন ধরাতে গিয়ে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালিয়ে হাত পোড়াতে পোড়াতে বেঁচে গেল, সানু তেলের টিন উলটে ফেলে অনেকটা তেল নষ্ট করল, সোনা মাংস বাছতে বসে বেশ কিছু কাক জড়ো করে ফেলল মাথার ওপর। এইভাবে আমাদের পারিবারিক চড়ুইভাতির প্রথম পর্বটা শুরু হলো। তারপর বেলা বাড়তে লাগল, শীতের হাওয়া ছুটতে লাগল বন থেকে বনে, আমাদের জঙ্গলের গায়ে গায়ে একটা দেহাতী গ্রাম, কিছু বাগাল আর কুকুরও জুটে গেল।

ভালই তো লাগছিল আমাদের, গাছতলায় রান্না চলছে, বউদি আর দিদির মাথায় কাপড় নেই, পান খাচ্ছে কথা বলছে, হাতাখুন্তি

নাড়ছে; হাসছে, ডাকছে, গল্প করছে। নীহার ফরমাস খাটছে দিদি আর আমাদের। ছেলেমেয়েরা হুল্লোড় করছে, দল বেঁধে নদীর দিকে চলে গেল, ফিরে এল বালি-জলে গেরুয়া হয়ে, গান গাইছে চেঁচিয়ে, পরস্পরকে রাগাচ্ছে, ভেঙাচ্ছে, শুকনো ডাল তুলে নিয়ে সোনা বড় খোকার পিঠে সপাসপ লাগিয়ে দিল। বড় খোকা বলল, "তুই জেনানা না মরদানা রে?" সোনা বলল, "জেনানাবেশী মরদানা।" বলে হি-হি হাসি, হাসতে হাসতে ভাগ্নে পূর্ণকে বলল, "ও বড়দা, বড় খোকাকে তোমার সেই মোচআলী মেমের গল্পটা বলে দাও।" দাদা ওদের দেখতে দেখতে হেসে বলল, "দেখো জ্যোতি, সোনাটা তার পিসির মতন হয়েছে।" আমি হাসলাম।

গোপা একটু শান্তশিষ্ট। হয়তো তার বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে বলে এখন একটু লজ্জায় লজ্জায় আছে। ভাইবোনেরা তো তাকে অহরহ খেপায়। গোপা একপাশে বসে বসে তার কাকির সঙ্গে গল্প করছিল। আমি তাকে কাছে ডাকলাম। গোপা আসতে বললাম, "কেমন লাগছে রে?"

"খুব সুন্দর।"

"তোর বিয়ের পর জামাইকে আর আনতে পারব না এখানে—এই যা দুঃখ।"

গোপা লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করে পালাল।

শীতের বেলা; দেখতে দেখতে দুপুর মরে আসছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে বেলা প্রায় নিবে আসার মতন হয়ে এল। তারপর বিশ্রাম। গাছতলায় সতরঞ্জির ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগল মেয়েরা, ছেলেরা মাঠেঘাসে পাতায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি একটু আড়ালে গিয়ে সিগারেট খেতে খেতে কেমন তন্দ্রার ঝোঁকে চোখ বুজে ফেলেছিলাম, নীহার এসে ডাকল।

"ওমা, ঘুমোচ্ছ?"

"না, তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। বসো।"

নীহার পাশে বসল। বলল, "তোমার জন্যে একটু সোডা এনেছিলাম ; অবেলার খাওয়া—, খাবে নাকি ?"

"না, এখানে আর সোডাটোডা কেন, এমন জল···"

"পান খাবে আরেকটা ?"

"দাও।"

নীহার পান দিল। দুপুর মরে আসছিল বলে বনের মধ্যে আবার শীতের ছোঁয়া লাগছিল। রোদ পালানো শুরু হয়েছে। সোনা গান গাইছিল কোথাও, তার গলা ভেসে আসছে।

নীহার বলল, "যাই বলো, জায়গাটা বেশ সুন্দর। এই এক মাস বেশ কাটল।"

"হ্যাঁ, বেশ আনন্দে।"

"ছেলেমেয়েরাও খুব খুশী। দেখাশোনা তো হয় না। জেঠা, জেঠি, পিসি, পিসেমশাই—এতগুলো ভাইবোন, হইচই করে বেড়িয়ে খুব আনন্দে কাটিয়েছে।"

নীহার আমার গায়ের দিকে একটু হেলে বসে থাকল খানিক। তারপর হঠাৎ বলল, "হ্যাঁ গো, দিদি কি সত্যিই কুয়ায় ঝাঁপ খেতে গিয়েছিল ?"

আমি চমকে উঠে নীহারের মুখের দিকে তাকালাম, "কে বলল ?"

"না, তখন জামাইবাবু বলছিলেন কি না, তাই জিজ্ঞেস করছি।··· ঠাট্টা তা হলে ?"

আমি কোনো জবাব দিলাম না, নীহারের কাঁধে হাত রেখে বসে থাকলাম।

৪

বেলা মরে আসতেই জঙ্গলে ছায়া জমতে শুরু করেছিল। শীতের হাওয়াটাও প্রখর হলো। কাঠকুটো জ্বালিয়ে চা খাওয়া হলো, তারপর

ফেরার তোড়জোড়। পাঁড়ে আর চাকর গাড়িতে হাঁড়িকুড়ি উনুন চাপাতে লাগল। আমরা সদলবলে নদীর দিকে বেড়াতে গেলাম। নদীর চরায় বিকেলের শীত নেমে গেছে, বাতাস দিচ্ছিল, বট আর শিমুলের মাথার ওপর তখনো শেষ বেলার রোদ গড়িয়ে পড়ছে। নিষ্প্রভ রোদ। কাঠুরেদের গাড়ি নদী ভেঙে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল, আকাশ কেমন অবসন্ন, মাঝে মাঝে ঝাঁক বেঁধে পাখি ফিরছে।

আমাদের শাল জঙ্গলের মাথায় একটু মেঘ এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

দাদা বলল, "এবার চলো, ফেরা যাক, আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে।"

নদীর চর থেকে আমরা ফিরতে লাগলাম। শীতের বাতাসটা ক্রমশই বাড়ছে। কনকন করছে। বউদি, দিদি, নীহার গায়ের শাল গুছিয়ে নিল। জ্যোতিদা তার গলাবন্ধ কোটের বোতাম আঁটল। গায়ের শাল দাদাও ভাল করে জড়িয়ে নিল। গোপা, সোনা, বিন্দু যে যার গরম জামা পরে নিয়েছে।

ফেরার সময় আমরা সকলেই প্রায় একই সঙ্গে ফিরছিলাম। গরুর গাড়িটা আগেই রওনা দিয়েছে।

আমাদের কারো খেয়াল হয়নি, হঠাৎ দিদি বলল, "কী সর্বনাশ! দেখেছ ?···আকাশটা দেখ একবার।"

তাকিয়ে দেখি, শাল জঙ্গলের মাথার ওপর মেঘটা অনেকখানি ছড়িয়ে গেছে, পেছন থেকে কখন মস্ত একটা মেঘের পুকুর এসে তার গায়ে গায়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক কালচে মেঘ নয়, কিন্তু কি রকম যেন পাংশু। ঝড় বা বৃষ্টির স্পষ্ট কোনো লক্ষণ এ মেঘে ছিল না। হয়তো মেঘলা হয়ে যাবে, বা মেঘটা সামান্য পরেই ফেটে আকাশময় ছড়িয়ে পড়বে। বাদলার গন্ধ নেই কোথাও, শীতের বাতাসটাই যা শন শন করে বইছিল।

পূর্ণ হেসে বলল. "মেঘ দেখলেই মা'র ভয়।···এটা বর্ষাকাল নয় মা, শীতকাল।"

দিদি বলল, "তুই কি পাঁজি লিখিস যে শীতে বৃষ্টি হবে না।... আমি মেঘ চিনি। এ বড় পাজী মেঘ।"

গোপা হেসে বলল, "তুমি এমন করে বলছ পিসি, যেন এই মেঘটেঘ নিয়ে তোমার ঘরসংসার।"

বড় খোকা বলল, "বৃষ্টি এলে আমাদের কি, আমরা দৌড়োবো ; ওল্ডরাই মুশকিলে পড়বে ; আর যারা কাছা দেয় না তারাই।"

সোনা বলল, "দৌড়ো না, তোকে আর এ জঙ্গলে কাছা সামলে দৌড়তে হবে না।"

দাদা বলল, "একটু পা চালিয়ে চলো সব। জঙ্গলের রাস্তা, আমাদেরও জানাশোনা নেই তেমন, নতুনই।"

পা অবশ্য কারো তেমন জোরে চলছিল না। সারাদিনের হই-হুল্লোড়, হাঁটাহাঁটি, অবেলায় খাওয়া, আলস্য ও শীতের জড়তার জন্যে সকলেই ঢিলে মেজাজে হাঁটছিল। মাঠঘাট থেকে রোদ চলে গেছে অনেকক্ষণ, গাছের মাথায় পাতলা রোদ যেটুকু ছিল তাও মুছে গেল। উত্তরের বাতাস গাছের পাতা কাঁপিয়ে শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে। টি-টি করে কেমন একটা পাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

বউদি বলল, "ঠাকুরঝি, আজ না পূর্ণিমা! সন্ধ্যের আগেই চাঁদ উঠবে।...একটু বাবা রয়ে-সয়ে চলো, চাঁদ উঠলে বাড়ি ফিরব।"

ছোট খোকা টপ করে বলল, "জেঠিমণি যে পোয়েট হয়ে যাচ্ছে, পূর্ণদা!"

পূর্ণ বলল, "তোর দেখাদেখি।"

ছোট খোকা আজ বনে খুব কবিতা আওড়েছে, হয়তো সেই জন্যেই পূর্ণ ঠাট্টা করে কথাটা বলল।

বউদি বলল, "বড্ড ফাজিল হয়ে যাচ্ছিস ছোটখোকা।"

কথা বলতে বলতে আমরা শাল জঙ্গল পেরিয়ে মাঠে এসে হঠাৎ অনুভব করলাম, চারপাশ যেন কেমন বাদলার মতন অন্ধকার হয়ে গেছে। শীতের বিকেল দেখতে দেখতে ফুরোয়, প্রথমে মনে হয়েছিল,

শীতের আঁধার জমে আসছে। পরে মনে হলো, বিকেল মরে যাওয়ার পর আবছা অন্ধকার এত দ্রুত ঘন হয়ে আসার কথা নয়, আজ পূর্ণিমা। মেঘলা জমেছে কি? আকাশের মেঘটাও বেশ কালো ও কুটিল হয়ে উঠেছিল।

দাদা বলল, "সারাদিন ভালোয় ভালোয় কেটে এখন ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে নাকি? নাও, তোমরা একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও।"

আমরা তখনো মেঘটার প্রকৃতি বা চরিত্র বুঝতে পারিনি, মনে হচ্ছিল—পৌষের শেষে বা মাঘে যে বর্ষণ নামে এই মেঘ তার বিক্ষিপ্ত কোনো টুকরো হবে। হয়তো আজ বাদলা জমবে, মেঘলা হবে, পূর্ণিমার চাঁদ আর দেখা দেবে না। তারপর কাল সকাল অথবা দুপুর থেকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টির চিন্তা আমাদের বিরক্ত করল।

দল বেঁধে আমরা আরো খানিকটা পথ চলে এলাম। বাতাসে বনের শুকনো পাতা খড়কুটো উড়ছিল, মাঝে মাঝে মেঠো ধুলো আসছিল। সূর্য অস্ত গেছে না আড়াল পড়েছে, আমরা বুঝতে পারছিলাম না। বেশ একটা ঝোড়ো ভাব, আলো মলিন। ছেলেমেয়েরা যে বনের মধ্যে এই ঝোড়ো ভাবটা খুব উপভোগ করছে তা ওদের আচরণ দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল। কখনো দু' পা ছুটে যাচ্ছে, কখনো মাটিতে বসছে, কখনো বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া ছড়িয়ে দিচ্ছে, কখনো গান গেয়ে উঠছে, একে অন্যকে ধুলো পাতা ঘূর্ণির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মাঠ শেষ করে আবার বনে এসে পড়লাম। তারপর ঝাপসা আঁধার এবং গাছপালার শব্দের মধ্যে আমাদের পথ একটু ভুল হয়ে গেল। দাদা এমন একটা রাস্তা ধরল যে, খানিকটা এগিয়ে আমরা আর পথ দেখতে পেলাম না।

দাদা বলল, "রাস্তাটা গোলমাল হয়ে গেল যে। কি রে প্রশান্ত, তুই কিছু বললি না তো তখন?"

"আমিও বুঝতে পারিনি। চলো পিছিয়ে যাই।"

জ্যোতিদা বলল, "জঙ্গলের রাস্তার এই দোষ, পায়ের চিহ্ন না থাকলে চেনা যায় না।"

আবার পেছনে ফিরে এসে আমরা পথ পেলাম। ততক্ষণে ঝড় উঠে গেছে। শীতের ঝড়ে গায়ে কাঁপুনি ধরছিল।

ওই ঝড়ের মধ্যে চোখ রগড়াতে রগড়াতে আমরা বন পেরিয়ে এলাম। এবার সেই আমলকী বন। এখান থেকে আমাদের বাড়ি এমন কিছু দূর নয়। কিন্তু ততক্ষণে চারদিক কালো হয়ে গেছে। শীতের সন্ধ্যে, আকাশের মেঘ, বনভূমি—সব মিলেমিশে হঠাৎ এই সান্ধ্যমুহূর্ত কেমন রাত্রের চেহারা নিয়েছিল। ঝোড়ো বাতাসটা থামেনি, থামার লক্ষণও ছিল না। গাছ-পাতার ফাঁকে ফাঁকে বোধ হয় হিম জমতে শুরু করেছিল, কুয়াশার ভাব যেন।

গোপার শীত করছিল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, "কাকামণি, বড্ড শীত।"

"তুই আমার চাদরটা নে।"

"আর তুমি?"

"আমার গায়ে সোয়েটার আছে, গরম ফতুয়াটা রয়েছে···। নে, চাদরটা নে, নিয়ে কান-মাথা জড়িয়ে ফেল।" আমি গোপাকে গায়ের চাদরটা দিয়ে দিলাম।

দাদা কাশতে শুরু করেছিল। কাশতে কাশতে বলল, "বড্ড ঠাণ্ডা রে! হুট করে বিকেলেই এত ঠাণ্ডা পড়বে ভাবিনি।"

বড় খোকা, পূর্ণ আর সোনা একসঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান শুরু করে দিল, যেন শীতের জড়তা গায়ে বসতে দেবে না।

ছোট খোকা আর সানু দাঁত বাজিয়ে বাজনা বাজাচ্ছিল। বিন্দু তাদের গায়ে গায়ে।

আমলকী বন পাশে রেখে আমরা আবার সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। এটা ঠিক জঙ্গল নয়, ঘন ঝোপ, খানিকটা হাঁটলেই

পেরিয়ে যাওয়া যায়। তারপর ফাঁকা মাঠ, মাঠের শেষে আমাদের বাড়ি।

যেতে যেতে বউদি বলল, "চোখে যে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

দিদি বলল, "গাড়ির রাস্তা ধরে গেলেই হতো। অনেকটা ঘুর-পথ পড়ত, তবু এ আর পা ফেলা যাচ্ছে না।"

জ্যোতিদা সবার পেছনে। পেছন থেকেই বলল, "সাবধানে যাও। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, বাড়ি তো পৌঁছেই গেলে।"

বলতে না বলতে বড় খোকারা হঠাৎ যন্ত্রণার শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কি হলো রে?"

"কি যেন ফুটলো!"

"কাঁটা!" সোনা বলল।

"আমি গিয়েছি রে বাবা," পূর্ণ চেঁচাল, "কাঁটায় আটকে গেছি।"

ছোট খোকা আর সান্নু অতটা বোঝেনি, তারা এগিয়ে বড় খোকাদের অবস্থা দেখতে গিয়েছিল, গিয়ে কাঁটায় জড়িয়ে গেল। হাত পা মুখ কাপড় কিছু-না-কিছু আটকে যাওয়ায় ওরা যন্ত্রণার শব্দ করছিল। অসহিষ্ণুতা ও বিরক্তি প্রকাশ করছিল।

দিদি বলল, "সেই কাঁটা···, সকালে নীহারের শালে জড়িয়েছিল।"

বউদি বলল, "কী সর্বনাশ! তা এখন ছেলেমেয়েগুলোকে ছাড়াই কি করে?" বলে দাদার উদ্দেশে রাগ করে বলল, "সকালে দেখল, তবু এই রাস্তা ধরে আসার কি দরকার ছিল!"

ছেলেমেয়ের দল তখন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যে যার কাছের মানুষের কাঁটা ছাড়াবার অক্ষম চেষ্টা শুরু করেছে। বউদি আর নীহার সাবধানে এগিয়ে গেল, গোপা আমার পাশে।

পূর্ণ চেঁচাচ্ছিল, "এ কী কাঁটা রে বাবা, গায়ের ছাল মাংস পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কই, সকালে তো দেখিনি।"

বড় খোকা বলল, "আমরা এ-রাস্তায় মোটেই যাইনি।"

সোনা কেঁদে ফেলে বলল, "বাবা গো, আমার গালে কাঁটা ফুটে গেছে।"

বউদি আর নীহারও শেষ পর্যন্ত কাঁটার হাত থেকে বাঁচতে পারল না। পারা সম্ভব নয়। মাথার ওপর থেকে, পাশ থেকে বটের ঝুরির মতন পাতা নেমেছে। লতায় লতায় চারদিক ঢাকা, পাতা আর অজস্র কাঁটা সেই লতায়। এমনকি মাটিতেও ঝোপের গা বেয়ে বেয়ে কাঁটালতা থিক থিক করছে। একপাশে একটু ফাঁকা ছিল, যেখান দিয়ে সকালে আমরা এসেছিলাম; কিন্তু এই অন্ধকারে সেই নিষ্কণ্টক ক্ষুদ্র পথটুকু খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

দাদা ভয় পেয়ে বলল, "কি করা যায় জ্যোতি, এ যে বড় বিপদে পড়লাম।"

জ্যোতিদা বলল, "আলো-টালো থাকলেও না হয় চেষ্টা করতাম, কিছু বুঝতে পারছি না।"

আমিও বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি করা যায়। আলো বলতে আমাদের কাছে দেশলাই; জ্যোতিদার কাছে অবশ্য লাইটার আছে। কিন্তু এই বাতাসে দেশলাই বা লাইটারের আলো কতটুকু কাজ দেবে! এতগুলো লোকের এত কাঁটা এভাবে ছাড়ানো সম্ভব না।

দাদা রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল; বলল, "আমাদের মধ্যে কেউ যদি বাড়ি যেতে পারত! আলো আর চাকর-বাকর নিয়ে ফিরে আসত।"

দিদি অধৈর্য হয়ে একটা দেশলাই চাইল। বলল, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখলেই রাস্তা পাবে নাকি। ছেলেমেয়েগুলো কাঁটা ফুটে মরছে। দাও, দেশলাই দাও।"

আমি দেশলাই দিলাম। দিদি মাটিতে উবু হয়ে বসে খড়কুটো শুকনো পাতা জড়ো করতে লাগল।

জ্যোতিদা বলল, "দাঁড়াও, আমার লাইটারটা জ্বালি।"

প্রথমে রুমালে আগুন জ্বালিয়ে তারপর সেই জ্বলন্ত রুমাল শুকনো পাতার মধ্যে দিতে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। অন্ধকারে এই আলোটুকু জ্বলতে আমরা অনেকটা স্পষ্ট হলাম। দৃশ্যটা বড় অদ্ভুত। পূর্ণ, বড় খোকা, ছোট খোকা, সানু, সোনা, রবি, বউদি, নীহার— এমনকি বিন্দুটা পর্যন্ত কাঁটা ঝোপের সামনে চুম্বকের মতন আটকে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, এক মুঠো আলপিন চুম্বকের কাঠিতে আটকে থাকলে যেরকম দেখায় অনেকটা সেই রকম। কারো গাল ছড়েছে, কারো হাত, কেউ পা তুলে দাঁড়িয়ে। চুলে জামায় কাপড়ে কাঁটালতা জড়ানো। সকালে এতটা লক্ষ করিনি, এখন দেখলাম, বিশাল গুহার মতন চারপাশে বেড়ে দিয়ে যেন একটা কাঁটাকুঞ্জ হয়ে আছে ওখানটায়, আশপাশের সব গাছ-পালায় জড়িয়ে রয়েছে কাঁটালতা, জড়িয়ে ছড়িয়ে ঘন একটা বাধা সৃষ্টি করেছে; মাটিতে কিছু ফণিমনসা।

দিদির জ্বালানো পাতার চুল্লি যেভাবে জ্বলছিল তাতে নিবে যেতে সময় লাগবে না। আমরা আশপাশ থেকে পাতা আর শুকনো কাঠি এনে আগুনের মধ্যে ফেলতে লাগলাম।

দিদি বউদির মাথার কাপড় আর আঁচল থেকে সাবধানে কাঁটালতাব ডগা সরিয়ে বউদিকে মুক্ত করল; দাদা সানুকে কাঁটার বাঁধন থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল আপ্রাণ। জ্যোতিদা বিন্দুকে অতিকষ্টে ছাড়িয়ে এনেছিল। গোপা আর আমি দু' হাতে সমানে পাতা জড়ো করছি, শুকনো কাঠি ভেঙে ভেঙে আগুনের মধ্যে ফেলছি। বাতাসের জন্যে আগুন এলোমেলো হয়ে জ্বলছিল, দেখতে দেখতে পাতা পুড়ে যাচ্ছিল। অজস্র পাতা এখানে কোথায় পাব! অন্ধকার থেকে পাতা সংগ্রহ করে আনাও সম্ভব নয়। ঝোড়ো দমকা শীতের কনকনে হাওয়া বনের চারদিক বেড় দিয়ে যেন নাচছিল, পাতার শব্দে আমরা চমকে উঠে ভাবছিলাম, বুঝি বৃষ্টি এল! বৃষ্টি এসে পড়লে

পাতার আগুনটুকু নিবে যাবে, আমরা সপরিবারে কাঁটার বনে আটকে থাকব। সারা রাত এই জঙ্গলে, শীতে, বৃষ্টিতে বন্দী হয়ে থাকার চিন্তায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

দাদা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সান্নুকে ছাড়াতে গিয়ে নিজেই কখন কাঁটার জঙ্গলে জড়িয়ে গেল। জড়িয়ে গিয়ে আতঙ্কের একটা শব্দ করল। এ-রকম শব্দ আগে আর কেউ করেনি।

দিদি বলল, "কি হলো ?"

দাদা জবাব দিল, "আর কি হবে, আমিও আটকে গেলাম।"

নীহার যেন কোনো মন্ত্রবলে কাঁটার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়েছে ; ঝাঁপ দিয়ে সরে এল। অনেকক্ষণ থেকে সে চেষ্টা করছিল।

জ্যোতিদা সোনার কাঁটা ছাড়িয়ে ফেলছিল। এমন সময় বাদলা গন্ধ এল।

গোপা কোথাও শুকনো পাতা খুঁজে পাচ্ছিল না। বলল, "কাকামণি, এবার— ?"

পায়ে করে টেনে টেনে যা জোটাতে পারলাম জুটিয়ে আগুনের কাছে রাখলাম ; বললাম, "এবার আর কি, বসে থাকতে হবে··· ।"

গোপা ভয়ে আঁতকে উঠল।

ছেলেমেয়েরা এতক্ষণে বেশ বিরক্ত এবং অধৈর্য। তাদের আর সহ্য হচ্ছিল না। এই জঙ্গল, বন, কাঁটাগাছ—সমস্ত কিছুকেই তারা গালাগাল দিতে শুরু করল।

আমাদের কারো চেষ্টার অন্ত ছিল না। ছেলেমেয়েরা, বউরা—সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছিল এই বিশ্রী জঘন্য কাঁটার জঙ্গল থেকে মুক্তি পাবার। বউদি বিরূপ হয়ে উঠেছিল, নীহার তার মেয়ে সোনার জন্যে ছটফট করছিল, আর-একটু হলেই তার মেয়ের অমন সুন্দর চোখ যেত। দাদা চেঁচামেচি শুরু করেছিল। এক জ্যোতিদা তখনো বেশ শান্ত, সুস্থির, রসিকতাও করছে ঃ 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন

কমল তুলিতে? বুঝলি সোনা, এত সুখ-আনন্দ যে করলি, তার জন্যে তোর ঠাকুর্দার বেণুকুটকে একটু দাম দিবি না!"

দিদি বলল, "তোমার তামাশা রাখো, মেয়েটাকে ছাড়াও আগে।"

"ছাড়িয়ে দিয়েছি।"

"তবে ও দাঁড়িয়ে আছে কেন?"

"যাচ্ছে, ওর হাত ধরে টেনে নাও।"

বড় খোকা বেপরোয়া হয়ে জামাকাপড় ছিঁড়ে গা-মুখ কেটে পাতার আগুনের কাছে ঝাঁপ খেয়ে পড়ল।

আমি ডাকলাম, "দিদি?"

"উঁ—!"

"এ আগুন আর তো জ্বালিয়ে রাখা যাবে না; পাতা পাই কোথায় আর?"

গাছের পাতায় আবার শব্দ উঠেছিল বৃষ্টির মতন, তারপর টুপ টুপ করে জলের ক'টা ফোঁটা যেন পড়ল।

গোপা বলল, "বৃষ্টি—।"

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, পাতার শব্দ না বৃষ্টি; বৃষ্টি হলে অনেক জোরে বড় বড় ফোঁটায় পড়া উচিত ছিল। নাকি গাছের আড়াল বলে আমরা বুঝতে পারছি না। ছাতাগুলোও সব গাড়িতে।

আগুন ক্রমেই নিবে আসছে। বৃষ্টি আসলেও আসতে পারে। আমাদের মধ্যে সে যে কী এক আতঙ্ক এল, বিন্দু কেঁদে ফেলল, সোনা তার মা'র হাত ধরে কাঁপতে লাগল। দাদা উন্মাদের মতন করছিল, বউদি গোপাকে নিয়ে একপাশে সরে গেল।

দিদি আর কোনো উপায় না দেখে তার গায়ের দামী শালটা খুলে আগুনে ফেলে দিল। দাউ দাউ করে খানিকটা আগুন জ্বলে উঠল। ছোট খোকা তখনো তার হাতের কাঁটা ছাড়াচ্ছে।

তারপর দেখতে দেখতে বৃষ্টি এল। বড় বড় ফোঁটা পড়ল। শীতের রাত্রের বাতাস আরো ধারালো হয়ে আমাদের সর্বাঙ্গ বিক্ষত করে অসাড় করে বয়ে যেতে লাগল। আগুন নিবে গেছে। অন্ধকারে, শীতে, বৃষ্টিতে, কুৎসিত হিংস্র এক কাঁটাবনের মধ্যে আমরা সপরিবারে আবদ্ধ হয়ে থাকলাম, মাথার ওপর দিয়ে ঝোড়ো বাতাস আর মেঘ ভেসে যেতে লাগল।

এভাবে কতক্ষণ ছিলাম খেয়াল করিনি, করা সম্ভব ছিল না। বৃষ্টির পশলা কেটে গেলে মেঘ সরে শীতের জলো চাঁদ-পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিল। সেই চাঁদের আলোয় আবার আমরা পরস্পরকে খানিকটা দেখতে পাচ্ছিলাম।

জ্যোতিদা বলল, "অকারণ ব্যস্ত হয়ো না ; এভাবে যেতে পারবে না কেউ। খানিকটা অপেক্ষা করো, বাড়ি থেকে আলোটালো নিয়ে লোক আসবে নিশ্চয়। এতটা রাত হয়ে গেল, আমরা ফিরছি না— ওরা কি আর না ভাবছে ?"

আমার মনে পড়ল, বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা জগদীশবাবুর থাকার কথা। দলিল দেখাতে আসবেন। তিনি নিশ্চয় আমাদের ফিরতে না দেখে ব্যস্ত হয়ে লোকজন আলো নিয়ে খুঁজতে বেরুবেন। কথাটা দাদাকে বললাম।

অপেক্ষা করা এবং আশা করা ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না।

অর্ধ-সিক্ত বস্ত্রে শীতে অসাড় হয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে আমরা যখন দাঁড়িয়ে আছি, তখন জ্যোতিদা কি ভেবে বলল, "এই কাঁটাগাছ কে পুঁতেছিল আমি জানি।"

দাদা বলল, "বাবা।"

"না", জ্যোতিদা বলল, "শ্বশুরমশাই কুয়াটা বুজিয়েছিলেন ; তার চারপাশ ঘিরে কাঁটাগাছ পুঁতে দেননি।"

"কে দিয়েছিল তবে ?"

"মা।"

"মা ! মা কেন ?" বউদি বলল।

জ্যোতিদা সে-কথার কোনো জবাব দিল না। পরে বলল, "সেই কথাটা আমার মনে পড়ছে, বাইবেলের বোধ হয় ঃ দাও হ্যাস্ট্ সার্ভড্ দি ব্যাড্ ওআইন ফার্স্ট অ্যাণ্ড লাস্ট্ অফ্ অল্ দি গুড।... তা প্রায় ধরো তিরিশ বছর ধরে আড়ালে আড়ালে এই মন্দটা—ওই কাঁটা বেড়েছে।"

দিদি জ্যোতিদাকে থামিয়ে দিল। অপ্রসন্ন, বিরক্ত ; বলল, "তোমায় এখন আর পাদ্রী সাজতে হবে না, চুপ করো।"

দিদি রাঁচি মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করেছে ও থেকেছে, বাইবেল ভালই জানত। আমরা অল্প-স্বল্প। তবু জ্যোতিদার কথার মর্ম বোধ হয় তিনজনেই বুঝতে পারছিলাম।

জ্যোতিদা বলল, "চুপ করার কি আছে স্নুনু, আমি কি মিথ্যে বলেছি !"

"সব কথা সব জায়গায় বলার নয়—" দিদি বলল। "পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি এখন ?"

জ্যোতিদা হাসল যেন, "পুরনো কাঁটা কেমন বাড়ে দেখছ না, পুরনো কাসুন্দি ভেবে সব ফেলে রাখলে কি আর বাঁচা যায় !"

দিদি অধৈর্য হয়ে বলল, "আঃ, থামো।"

তারপর এক সময় সত্যিই আমরা কাঁটাবন থেকে উদ্ধার পেলাম। জগদীশবাবু লোকজন, পেট্রম্যাক্স বাতি, টর্চ, লাঠি নিয়ে হাজির। ওদের সাড়া পেতে আমরা সাড়া দিলাম। সাড়া পেয়ে কাছে এসে আমাদের অবস্থা দেখে জগদীশবাবু স্তম্ভিত।

কাঁটাবনের বাইরে এলে আবার আমরা একটা দল হলাম। ক্লান্ত, অবসন্ন, হাত-পায়ে কাঁটার জ্বালা, জামাকাপড় ভেজা ভেজা, ছেঁড়া ফাটা ; খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অবসাদে আর শীতে দুর্বল পায়ে বাকি পথটুকু পেরোতে লাগলাম।

ছেলেমেয়েরা আর হইচই করছিল না ; করার অবস্থাও ছিল না।

সামান্য দূরেই আমাদের বাড়ি। জগদীশবাবু লোকজন নিয়ে এগিয়ে গেছেন, ওদের হাতে দুটো পেট্রম্যাক্স বাতি। আকাশ এখন পরিষ্কার, পূর্ণিমার চাঁদ উঠে আছে, দু-এক আঁচড় কালচে মেঘ ছড়ানো, হিম জড়িয়ে মাঠঘাট ঝাপসা, চাঁদের আলো ভেজা ভেজা লাগছিল।

আমি, জ্যোতিদা, দাদা পাশাপাশি; বউদি, নীহার, দিদি ওপাশে। একই সঙ্গে চলেছি।

যেতে যেতে জ্যোতিদা বলল, 'সুনু, তখন তুমি রাগ করলে, কিন্তু সত্যি করে বলো তো, তোমাদের সংসারে নোংরা মদটা আগে খেতে দেওয়া হয়েছিল কি না!"

দিদি এবার বিরক্ত হলো না, কিন্তু অস্বস্তি বোধ করে 'আঃ' বলল।

জ্যোতিদা বলল, "আমি খুব খুশি হয়েছি। কুয়ো বুজিয়ে কাঁটার বেড়া দিয়ে দিলেই কি পাপ মুছে যায়!"

দিদি বলল, "পুরোনো কথা কেন তুলছ তুমি!"

"ক্ষতি কি তুললে, ছেলেমেয়েরা তো শুনছে না।

দিদি আর কথা বলল না।

দাদার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর, তবু দাদা যে কেন ওই কুয়া আর কাঁটার বিষয় কিছু বলছিল না, আমি জানি না। অথচ আমি জানি, কথাটা আমাদের সকলেরই জানা আছে, মনে আছে। আমি বললাম, "ওই কুয়াটা আমাদের কলঙ্ক, যার গর্ভে আমরা জন্মেছি তার ভেতরটা কী নোংরা আর অন্ধকার ছিল!···আর ওই কাঁটা হলো পাপ; পরম পাপ।"

কথাটা আমি কেমন করে বলেছিলাম জানি না, কিন্তু বলার পর আমি নিজেই নিজের গলার স্বরে চমকে উঠলাম, মনে হলো আমি অন্যদেরও চমকে দিয়েছি। সকলেই স্তব্ধ।

দাদা সামনের মস্ত একটা তেঁতুলগাছের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চাপা গলায়, যেন সব জেনেও শেষবারের মতন কিছু বাঁচাবার চেষ্টা করছে, বলল, "বাবা রতীনদাকে সত্যিই মেরেছিল?"

"হ্যাঁ—" দিদি বলল, নিদ্রিত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে কথা বললে যেমন শোনায়, তার গলা সেরকম শোনালো, "আমি জানি বাবা মেরেছিল।"

বউদি আর নীহার আঁতকে ওঠার শব্দ করল। ওরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

জ্যোতিদা বলল, "আত্মসম্মানের জন্যে ?"

দাদা বাধা দিল, "না, মা'র জন্যে, মা'র জন্যে সমস্ত। বাবা বোধহয় বোঝেনি···"

"কে বলল!" দিদি হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গিয়ে রাগের গলায় বলল, "বাবা সব বুঝেছিল; সমস্ত।"

রতীনদা রাঁচি থেকে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। দিদির লোভে লোভে সে কয়েকবারই এসেছে। দিদিকে সে ভালবাসত, দিদি তাকে ভালবাসত। শেষবার এসে মাসখানেক ছিল। মা তাকে রেখে দিয়েছিল। মা তাকে নিজের জন্যে কাছে রাখার চেষ্টা করত, ছুতো বের করত। দিদির জন্যে মা'র হিংসে ছিল। রতীনদার জন্যে মা'র এমন একটা অস্থিরতা জন্মে গিয়েছিল যে, মা তার চাতুর্যও ধরে রাখতে পারত না, প্রকাশ হয়ে পড়ত। মা বোধ হয় শেষেব দিকে রাত্রে ঘুমোতে পারত না। আমাদের বাড়িতে রেখে মা রতীনদাকে নিয়ে জঙ্গলে যেত। বাড়ি আর জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলই মা'র বেশি পছন্দসই জায়গা ছিল। অমাবস্যায় যেন মা'র জোয়ার উঠত।

"মা," আমি বললাম, "আমি জানি জ্যোতিদা, মা রতীনদাকে কি রকম চোখে যেন দেখত। সেরকম চোখে বাবাকেও দেখত না। ভাঙা গির্জের মাথায় পুরনো ঘণ্টা বেজে উঠলে যেমন লাগে, রতীনদার সামনে মাকে সে রকম লাগত।"

বউদি ছি ছি করল, নীহার মাথার কাপড় টেনে নিল আরো।

দিদি বলল, "মা'র ওই রকমই স্বভাব, বরাবরের নোংরা; আমরা মা'র জন্যে কেউ বাড়িতে থাকতাম না, বাইরে বাইরে; বাড়িতে

মানুষ হতে পারিনি। ওই ছুটিছাটায় একসঙ্গে হতুম।"

দাদা বলল, "আমার বাড়ি ভাল লাগত না। মা আমাদের আদর-যত্ন করার চেষ্টা করত, হয়তো ভালবাসত, কিন্তু নিজেকে মা সামলাতে পারত না।"

জ্যোতিদা বলল, "কিন্তু ওই কাঁটার বেড়া দিয়ে উনি তো শেষ পর্যন্ত কিছু সামলাতে গিয়েছিলেন, বসন্ত ?"

দাদা কোনো জবাব দিল না।

দিদি বলল, "আমাকে সামলাতে।...ওই কুয়ার সামনে রতীনদা আর মা ছিল। সন্ধ্যেবেলায় অন্ধকারে বাবা রতীনদাকে মারে, মেরে কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত কোনো খোঁজ হয়নি। তারপর বাবা খোঁজার রব তোলে, থানায় খবর পাঠায়।...কিছু হয়নি ; বাবা বলে—ওটা হয় অ্যাকসিডেণ্ট, না হয় আত্মহত্যা।...ওই জঙ্গলেই তাকে পোড়ানো হয়। তারপর কুয়া বুঁজিয়ে ফেলা হয়েছিল।"

জ্যোতিদা বলল, "তুমি ওই কুয়ায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলে।"

"দুঃখে, লজ্জায় বা ঘেন্নায় নয়," দিদি যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে বলল, "আমি কেন ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলাম তোমরা জানো না, আমি জানি। রতীনদা আমার জন্যে সত্যিই মরেনি ; আমি তাকে মারিনি। তবু আমি ওই কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মরতে গিয়েছিলাম মা'র জন্যে।...না, মা'র জন্যেও ঠিক নয়, আমাদের সকলের জন্যে। ভালবাসার জন্যে মরা যায়, মরে নিজেকে বাঁচানো যায়—মাকে আমি শেখাতে গিয়েছিলাম। আমি মরলে মা'র নিজেকে বদলাবার সুযোগ ঘটত। ...মা..." দিদি আর বলতে পারল না।

মা'র যে সেটাও সহ্য হয়নি আমরা জানতাম ; মা ভালবাসার জন্যে মরা পছন্দ করত না, বরং মারাই পছন্দ করত। ও পথটা মা বরাবরের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছিল কাঁটা দিয়ে।

দাদা রাগে বেহুঁশ হয়ে বলল, "কী গর্ভেই আমরা জন্মেছি! নোংরা, নোংরা। ওটা যদি বুঁজিয়ে দিতে পারতাম...।"

নীহার ঘৃণায় মাটিতে থুথু ফেলল। বউদি বিড় বিড় করে বলল, "জন্তু-জানোয়ারের অধম।"

আমরা অনেকক্ষণ আর কেউ কোনো কথা বললাম না।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম এবার। শীতের জ্যোৎস্নায় নিবিড় একটা দুঃখ-বলয় সৃষ্টি হয়েছে, মাঠ অসাড়, দূরে টিমটিম বাতি জ্বলছে, কাঁঠালতলায় আগুন জ্বালিয়ে কারা যেন প্রসবিনী গাভীকে শুশ্রূষা করছে। কোথাও কেউ রামায়ণ গাইছিল সুর করে, গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছিল।

জ্যোতিদা হঠাৎ বলল, "সুমু, তোমাদের দেখে আজ আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।"

আমরা জ্যোতিদার দিকে তাকালাম।

জ্যোতিদা আস্তে করে দিদির কাঁধ ছুঁয়ে বলল, "ভালবাসা পাওনি বলে তোমরা আজ ভালবাসা শিখছ। ভালবাসা শেখার জিনিস, সংসারেই শিখতে হয়। তোমার মাকে কিছু শিখতে হয়নি, শরীরের জন্যে শিখতে হয় না।"

দিদি আরো কিছুক্ষণ কথা বলল না, শেষে বলল, "কী জানি, আজ আরো বেশি করে যেন লাগছে। কোথায় লাগছে, তোমাদের কেমন করে বোঝাব!···মনে হচ্ছে, আমরা আমাদের ছেলেমেয়ে সব নিয়ে কি এক কাঁটার জঙ্গলে আটকে গেছি।"

দিদি কথাটা এমন করে বলল, মনে হলো, যেন আমাদের সমস্ত চৈতন্য আজ কোনো অব্যক্ত বেদনায় কেঁদে ওঠার জন্যে গুমরে উঠেছে। আমরা কি কাঁটার জঙ্গলে আটকে থাকব!

তারপর বাড়ির কাছে পৌঁছে গেলাম। রেণুকুটের বাড়ি, বাগান, জঙ্গল আমরা বেচে দিয়েছি, আমাদের কোনো মায়ামমতা থাকার কথা আর নয়, তবু শীতের সেই জ্যোৎস্না এবং হিমের মধ্যে, গাছ এবং বাগানের মধ্যে আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে চোখে জল এল।

সংশয় / আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

একরত্তি পাখিটার কাণ্ড দেখেই যেন স্থনয়নী হেসে ফেললেন। বয়সের গলা বলে হাসিটা প্রবল বা চপল হলো না, সামান্য মোটা ও চাপা শোনাল, বেশ সরল। পাখিটা দেখতে দেখতেই স্থনয়নী বললেন, "এ জিনিসটা তোমায় বেশ দিয়েছে।"

আর্ম-চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসে সুধাকান্ত সিগারেট খাচ্ছিলেন, চেয়ারের চওড়া হাতলে সোনার জল ধরানো সিগারেট কেস, চকচকে নতুন লাইটার। এই-সিগারেট কেস, লাইটার, সিগারেট সবই তিনি পেয়েছেন। খুব নরম, দামী তামাকের ধোঁয়া তাঁর গলায়; ছেলেরা জানত, তিনি নরম তামাকটাই পছন্দ করতেন বরাবর, দেবার সময় পছন্দসই তামাকটাই দিয়েছে।

স্থনয়নী বললেন, "এ তোমার বেশ দামীই হবে, না?"

সুধাকান্ত অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, তা তো হবেই. বাইরের জিনিস, খুঁজেপেতে যোগাড় করেছে; আজকাল এসব আর এখানে পাওয়া যাবে কোথায়!"

সুনয়নী পাখিঅলা ঘড়িটার কারুকর্ম আরো একটু যেন দেখলেন। না দেওয়াল-ঘড়ি না টাইমপিস, দেখতে শুনতে মাঝারী, রুপোলী গা, মাথার দিকটা গির্জের চূড়ার মতন, ঘড়ির কাঁটা দুটো উজ্জ্বল বাদামী রঙের, ঘণ্টার দাগগুলো কী ছিমছাম সুন্দর। আর ওরই মধ্যে একটা একরত্তি পাখি সেট্ করা; হেয়ারপিন কিংবা ছোট ব্রোচে অনেকটা এই ধরনের পাখিটাখি আগে দেখেছেন সুনয়নী; তবে এ জিনিস আরো সুন্দর। কীরকম সবুজ লালে মেশানো রঙ, ঠোঁটের ডগায় একটা একবিন্দু পুঁতি; ন'টার ঘর থেকে লাফিয়ে দশটার ঘরে এল পাখিটা, যেন দাঁড়ে বসে লাফাতে লাফাতে সরে যাচ্ছে; এরপর যাবে এগারোটায়, তারপর বারোটায়।' অথচ বাইরে থেকে দৃষ্টিকটু কিছু নেই, শুধু একটা গোল করে কাটা ফাঁক, যার মধ্যে দিয়ে পাখিটা মুখ বাড়িয়ে রয়েছে।

সুনয়নী আদর করেই যেন শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘড়িটার কাঁচ মুছে দিলেন। "তোমায় যা দিয়েছে সবই ভাল জিনিস।"

জিনিসগুলো সবই প্রায় ছড়ানো ছিল: ইলেকট্রিক শেভার, সিগারেটের পাইপ, হাড়ে বাঁধানো ছড়ি, এক সেট গীতা উপনিষদ, দামী শাল, বিদায় অভিনন্দনপত্র, এমন কি পরিপাটি করে বাঁধা এক বোতল হুইস্কি। শেষেরটা অবশ্য তাঁকে গাড়িতে তুলে দেবার সময় চন্দ্রসাহেব দিয়েছিলেন; আড়ালে বস্তুটি গাড়ির মধ্যে হাতে ধরিয়ে দিয়ে হেসে বলেছিলেন, "দিস ইজ ফ্রম মি, স্যার···"।

'স্যার'-টা ঠাট্টা করে বলা।

অবসর হওয়ায় সুনয়নী এবার বিছানায় এসে বসলেন। ঘরের পশ্চিম দেওয়ালে বাতিটা জ্বলছে, ফুলতোলা কাঁচের শেড পশ্চিমের খানিকটা দেওয়ালে অস্পষ্ট অথচ ছড়ানো একটা ছায়া ফেলেছে। এখন হেমন্তকাল, অগ্রহায়ণ, মাথার ওপর পাখা চলছে না, জানলা আধ-খোলা।

মাথার কাপড় অভ্যাসবশে খোঁপার কাছাকাছি একটু টেনে

সুনয়নী শুধোলেন, "কত লোক হয়েছিল ?"

সুধাকান্ত সিগারেটটা নেবালেন। "মন্দ কি !"

"অনেক— ? অফিসসুদ্ধ ?"

"তা একরকম সব সেকসানের লোকই ছিল।"

"প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছিল নাকি গো ?" সুনয়নী স্বামীর সঙ্গে যেন রঙ্গই করলেন একটু।

"না ; আমাদের একটা বড় হলঘর আছে, টেবিল-চেয়ার পড়েছিল।"

"তোমার সব বড় কর্তারা এসেছিলেন ?"

"দেখলাম তো অনেককেই···"

সুনয়নী চোখের চশমার আঙটা থেকে কানের চুল ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, "কি বললেন সব ?"

সুধাকান্ত অল্প হাই তুললেন। "কি আর বলবেন, এমনি সব কথা—শরীরটা ফিট রেখো, এখন কিছুদিন বেড়িয়ে এসো, তারপর টাকা-পয়সা তুলে বাড়িটায় হাত দাও, এবার একটু রিলিজানে মন দাও···"

"তোমায় সকলেই খুব ভালবাসত।" সুনয়নী গাঢ় গলায় বললেন।

সামান্য চুপ করে থাকলেন সুধাকান্ত, তারপর অন্যমনস্ক গলায় বললেন, "কি জানি। অনেকদিন চাকরি করলাম, সব সেকসানেই ছিলাম, হয়তো তাই জানাশোনা হয়েছিল সকলের সঙ্গে··· ।"

"শুধু জানাশোনা নয় গো, এমনি মুখ-চেনাচিনি থাকলে কি তোমায় এত বড় ফেয়ারওএল দিত ! সব্বাই তোমায় ভালবাসত, খাতির করত··· ।" সুনয়নী এমনভাবে বললেন যেন স্বামীর প্রতি অফিসের লোকের খাতির-ভালবাসা তিনিও অনুভব করতে পারছেন, পেরে বুক ভরে আসছে, এক ধরনের গর্বের সঙ্গে কেমন একটা ব্যথা জাগছে।

সুধাকান্ত কিছু বললেন না, হাত বাড়িয়ে লাইটারটা মুঠোয় নিলেন, বুড়ো আঙুল দিয়ে লাইটারের মসৃণ ঠাণ্ডা গা আলতোভাবে ঘষতে লাগলেন; বুড়ো আঙুলের তলায় একটা কড়ার মতন শক্ত চামড়া পড়েছে অনেকদিন, হয়তো দীর্ঘকাল কলম ধরে ধরে। তিনি সব সময় কলম চেপে লিখতেন, আঙুলের ডগায় জোর পড়ত। তাঁর কলম ধরাটাই শুধু কি শক্ত ছিল? কাজকর্ম করার এবং করাবার শক্তিও ছিল তাঁর। একটার পর একটা সেকসানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দক্ষতার জন্যে। দক্ষতা অনেক সময় শত্রুতার কারণ হয়, অন্তত সহকর্মীদের কাছে, ছেলেছোকরাদের কাছে। সুধাকান্ত মনে করতে পারেন না, তাঁর সঙ্গে ঐ ধরনের সম্পর্ক কোথাও বা কারো সঙ্গে তেমন হয়েছিল। তিনি যেখানেই গেছেন তাঁর চেয়ারের ওপর কুশন রেখে বসে অন্যদের ত্রুটি ধরে ধরে মর্যাদা আদায় করেননি। সে স্বভাব তাঁর নয়। লাগাম ধরে রেখেও যথাসাধ্য স্বাধীনতা দিয়েছেন তাদের; সমবয়সীদের 'তুমি' বলেছেন, বড়দের 'আপনি' এবং ছোটদের 'তুই-তোকারি'ও করেছেন, মাঝেমধ্যে শালাটালাও বলেছেন মজা করে। সহানুভূতি সমবেদনা না দেখিয়েছেন এমন তো মনে পড়ে না। প্রয়োজনে যথাসাধ্য করেছেন। এটা ঠিক, তিনি অন্য কাউকে তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে মাথা গলাতে দিতেন না বলে তাঁর দায়িত্ব মাঝে মাঝে তাঁকেই যন্ত্রণা দিত। তা দিক, তবু তিনি সামলে রেখেছিলেন সব দিক।

বিছানার কোলে পা টেনে নিয়েছিলেন সুনয়নী, গোড়ালির কাছটা চুলকোচ্ছিল। আজ সারাদিন থেকে থেকে বাঁ পায়ের পাতা চুলকেছে। এটা শুভ না অশুভ সুনয়নী ঠিক জানেন না; বোধ হয় শুভ: স্বামী মানে মানে তো বটেই—অফিসসুদ্ধ ছোট বড় সকলের ভক্তি ভালবাসা নিয়ে চিরকালের মতন বেরিয়ে এলেন—এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে! আজকালকার সংসারে মন্দটাই মানুষ বেশী দেখে, ভাল আর কতটুকু দেখতে পায়!

সুনয়নী বললেন, "লোকের হাসিমুখ দেখে বুড়ো বয়সে বেরোতে পেরেছ এই যথেষ্ট ! আমার তো কতরকম মনে হতো।"

সুধাকান্ত কোনো সাড়া দিলেন না।

বিছানার ওপর হেলে পড়ে সুনয়নী এবার হাত দিয়ে চাদরটা মুছতে লাগলেন, যেন এটা তাঁর অভ্যাস। বিছানা মুছে মাথার বালিশ আবার ঠিক করে গুছিয়ে পাতলেন। বললেন, "তোমার মেয়ের কথা শুনলে তখন ?"

সুধাকান্ত ঠিক খেয়াল করতে পারলেন না, স্ত্রীর দিকে তাকালেন ; জানতে চাইলেন, কি কথা ?

সুনয়নী বললেন, "তার তো ইচ্ছে, আমরা শীতটা তাদের কাছে গিয়ে থাকি।"

"বার্নপুরে ?"

"অসুবিধের কিছু নেই, বড় জায়গা, ঘরদোর ছেড়ে দিতে পারবে। শীতের সময়টাও ভাল, জলবাতাস তোমার সইবে।"

সুধাকান্ত বিশেষ কিছু ভাবলেন না ; বললেন, "জামাইয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকা আমার পোষাবে না।...দু'চারদিন হলে অন্য কথা ছিল—।"

সুনয়নী যেন এর চেয়ে ভাল জবাব প্রত্যাশা করেননি, করা উচিতও নয়, প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশ বছর ধরে মানুষটিকে তো দেখছেন, কখনো কোনো সময়েই আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গিয়ে উঠতে চান না। কিন্তু এবার অন্য একটু কারণও ছিল, মেয়ে আজ দিন পাঁচেক হলো এখানে এসেছে, আসার কারণটাই হলো—বাবা চাকরি থেকে অবসর নিচ্ছেন, নেবার পর সব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, হঠাৎ যেন হাতের সামনে থেকে এতদিনের বড় একটা অবলম্বন সরে যাবে, কিছু আর ধরতে পারবেন না, এত বছরের নিয়মিত অভ্যাস থেকে ছাড়া পাবেন, শরীর মন ভেঙে যাবে, অসুখ-বিসুখও বাধাতে পারেন। এ-রকম হামেশাই হয়। চাকরি থেকে ছুটি নেবার পর জীবন থেকেও কত লোক ছুটি নেয়। নিজের শ্বশুরই তার দৃষ্টান্ত।

"তুমি একেবারেই না বলছ, একটু রাজী হলে ভালই করতে", সুনয়নী বললেন। বলে বিছানা থেকে নেমে শোবার আগে জল পান খেতে গেলেন শ্বেতপাথরের গোল টেবিলটার দিকে।

সুধাকান্ত স্ত্রীর দিকে তাকালেন, "কেন বলো তো ?"

"বলব আর কি, তুমি কি আমার চেয়ে কম বোঝ ?"

সুধাকান্ত ভাবলেন সামান্য, বোঝবার চেষ্টা করলেন ; এমন কিছু মনে এল না যাতে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকার কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলেন।

সুনয়নী আলগোছে জল খাচ্ছিলেন ; জল খাওয়া শেষ হলে পানের ডিবে থেকে ছোট্ট খিলি নিঁয়ে মুখে দিলেন।

সুধাকান্ত বললেন, "আমি কিছু বুঝতে পারলাম না।"

জরদার কৌটো তুলে নিয়ে স্বামীর দিকে তাকালেন সুনয়নী। জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, শীত-শুরুর হাওয়া বাতাসে কেমন যেন হিম-শিশিরের গন্ধ। বাইরের দিকে ব্যালকনিতে মস্ত লতানো জুঁইগাছের লতাপাতায় আলোর পাতলা একটা প্রলেপ ছিল, এইমাত্র অন্ধকার হলো, আলো নিবে গেছে। বিনুর ঘর থেকে আলো আসছিল, বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল বোধ হয় এবার। সুনয়নী কয়েক পা এগিয়ে আলনা থেকে পাতলা চাদরটা উঠিয়ে নিলেন, খুব হালকা অথচ গরম চাদর, এই ঠাণ্ডা বাতাসটা তাঁর তেমন ভাল মনে হচ্ছে না।

সুধাকান্তর পায়ের দিকে জানলা প্রায় ভেজিয়ে হাতের চাদরটা স্বামীর গায়ে আলগা করে জড়িয়ে দিতে দিতে সুনয়নী বললেন, "তুমি একেবারে যাব না বললে বিনুর মনে খুব লাগবে।"

"কেন, মনে লাগার কি আছে ?"

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিলেন না সুনয়নী, অপেক্ষা করলেন, যেন তাঁর কিছু বলার রয়েছে। স্বামীর কাঁধে হাত রেখে একটু যেন হাত বোলালেন আলগাভাবে, তারপর বললেন, "তোমার মেয়ের

মনে কোথায় লাগে তা কি তুমি জানো না!···বিনুকে তুমি না বললে মেয়ে মুখে কিছু বলবে না, ভেতরে ভেতরে গুমরোবে। ওর বরাবরই তো সেই অভিমান, আমার পেটের মেয়ে নয়।···আমি বলি কি, ক'দিন গিয়ে থাকবে চলো, মেয়ে খুশী হবে।···তা ছাড়া বাপু বুড়ো হয়েছ, নাতিনাতনীর ওপর একটা টান থাকবে না!" শেষের দিকে সুনয়নীর গলায় গার্হস্থ্য কোমলতা ও উপদেশ ফুটল।

সুধাকান্ত সামান্য ভাবলেন, "বিনু তো এখন আছে।"

"আছে কোথায়, পরশুই চলে যাবে। তোমার জন্যেই ছুটতে ছুটতে এসেছিল, ছেলেটাকে রেখে এসেছে···সেটা তো দস্যু···"

"বিনুর সঙ্গে কথা বলবো'খন", সুধাকান্ত বললেন।

মুখে পান জরদার নেশা জমছিল; সুনয়নী বোধ হয় সেই নেশার জন্যে কিছুক্ষণ আর কথা বললেন না, দাঁড়িয়ে থাকলেন, অন্যমনস্কভাবে সুধাকান্তর মুখ দেখলেন, আলমারির আয়নাটা চোখে পড়তে নিজের মুখ, গলা, বুক এবং স্বামীর মাথা চোখে পড়ল। গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকেছে, শব্দটা কানে এল; কোথাও বোধ হয় কীর্তন গান হচ্ছে, ক্ষীণ একটু শব্দ এল যেন।

অন্যমনস্কতা কেটে যাবার পর সুনয়নী বললেন, "জল দি?"

"দাও—"

সুনয়নী শ্বেতপাথরের টেবিল থেকে কাঁচের গ্লাসে করে জল এনে দিলেন।

সুধাকান্ত জল খেলেন। বললেন, "তুমি শোও, আমি আসছি।"

জলের গ্লাসটা স্বামীর হাত থেকে নেবার সময় সুনয়নী হঠাৎ কি দেখে হেসে বললেন, "আজ যেন তোমায় অন্যরকম দেখাচ্ছে একটু।"

"কি রকম?"

"বুঝতে পারছি না ভাল—" সুনয়নী এই বয়সেও কপাল কুঁচকে চোখ আধ-বোজা করে কৌতুকের মুখ করলেন, "বুড়ো বুড়ো যেন,

তোমার এত চুল পেকে ধবধবে হয়ে গেছে, এ বাপু আমার আগে চোখে পড়েনি।”

সুধাকান্তও হাসিমুখ করলেন, হালকা গলায় বললেন, “এতদিন তাহলে তুমি অন্য চোখে দেখতে···”

সুনয়নী হেসে ফেললেন, মুখ জুড়ে হাসির সর পড়ল যেন, বললেন, “ভাল চোখেই দেখেছি বাপু, নিন্দে করতে পারবে না।”

“নিন্দে আর করছি কোথায়, প্রশংসাই তো করছি।”

“এ কিন্তু বেশ।”

“কি ?”

“বয়সে যা মানায়। তোমার ধবধবে চুল দেখে আজ বেশ চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে···” সুনয়নী খুব পরিতৃপ্ত, সরল, সুন্দর মুখ করে হাসলেন।

“আমারও বেশ লাগছে, তোমার আধখানা মাথা সাদা—”

“হাতে রেখে বলছ কেন গো, আমারও সবটা সাদা হয়ে এল।”

“কই, আমার তো চোখে পড়ছে না।” সুধাকান্ত হাসলেন।

সুনয়নী এবার হাসিমুখেই শূন্য গ্লাসটা রাখতে শ্বেতপাথরের টেবিলের দিকে চলে গেলেন। “তোমাতে আমাতে কত তফাত জানো ?”

“অনেক···।”

“প্রায় দশ।”

“এক যুগ।”

“আমার বিয়ে হয়েছিল পুরোপুরি কুড়িতে···, তোমার তখন তিরিশ।”

“গোঁফ রাখতাম তখন, বেশ মনে আছে।”

“রাখতে দিয়েছিলাম নাকি আমি—।”

“দাওনি ; কিন্তু আমিও তোমার একটা জিনিস রাখতে দিইনি।”

“একটা কেন গো কর্তা, কিছুই আর রাখতে দাওনি।”

"তুমি চাইলেই দিতাম !"

"দিতে—! সেই মানুষ তুমি ।"

"শেষ রাস্তায় এসে বদনাম করছ, সুনু—" সুধাকান্ত প্রসন্ন স্বরে বললেন, "বেশ, এখনো পথ পেরিয়ে পালিয়ে যাইনি, বলো কি চাও ?"

"বাব্বা, বর ভিক্ষা দিচ্ছ নাকি ?" সুনয়নী মাথার কাপড় টেনে হেসে বললেন ।

"তোমার এই বয়সে আবার কি বর দেওয়া যায়, না আমিই দিতে পারি !"

কথা শুনে সুনয়নী এবার খানিকটা জোরেই হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, "তবু বরই দাও ।"

"বেশ, বলো ।"

"আমি যেন আগে যাই—"

"কোথায় ?"

"যেখানে সবাই যায় ।"

সুধাকান্ত স্ত্রীর দিকে ভাল করে মুখ ফেরালেন। কয়েক মুহূর্ত যেন কিছু দেখলেন, তারপর বললেন, "ও জিনিসটা যে আমার দেবার নয়, সুনু ; ভগবানের হাত থেকে চুরি করাও যায় না ।···কিন্তু, আমি তোমার চেয়ে দশ বছরের বড়, আমার মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, আমারই তো আগে যাওয়ার কথা ।"

"না ; তোমার ছেলে আছে, এখনো পুরো মানুষ হয়নি !"

"ছেলে তোমারও, তুমিই তাকে মানুষ করো···"

"ও কি আমার ক্ষমতা !" সুনয়নী শ্বেতপাথরের টেবিলের সামনে থেকে সরে যাবার সময় আবার পাখিটা দেখলেন। পাশেই দেরাজের মাথায় ঘড়ি, ছড়ি, ইলেকট্রিক শেভার, বই, অভিনন্দনপত্র—ফেয়ারওএলের সব জিনিসই ছড়ানো আছে। পাখিঅলা ঘড়িটা চলছে, কাঁটা নেমে গেছে, আর খানিকটা পরে ওই একরত্তি পাখিটা টুক

করে লাফ মেরে এগারোর ঘরে চলে যাবে। সুনয়নী কেমন যেন আবেশভরে পাখি দেখতে লাগলেন। .

সুধাকান্ত ডাকলেন, "শুনছ ?"

"উঁ"...

"বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে শোও ; আমি আসছি।"

সুধাকান্ত এবার উঠলেন।

সুনয়নী আচমকা বললেন, "তোমায় সবাই ভালবেসে কত দিয়েছে, আমি যখন যাব, তখন তুমি কিছু দিও।"

সুধাকান্ত দেরাজের মাথার কাছে এসে সিগারেট কেস, লাইটার রাখলেন। জিনিসগুলো দেখলেন দু'পলক। তারপর স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলেন। "চলো, শোবে চলো ; রাত হয়েছে।"

আলো নিবিয়ে সুনয়নী শুতে এলেন। সুধাকান্ত শুয়ে পড়েছেন। পাতলা একটা জুট ব্ল্যাঙ্কেট বুক পর্যন্ত টেনে নিয়েছেন। সুনয়নী ঠাকুর প্রণাম সেরে আস্তে করে বালিশে মাথা রেখে শুলেন ; পাশে গায়ে ঢাকা দেবার মোটা সুজনী-চাদর, কাঁথা-কম্বল এখনি গায়ে দিতে পারেন না। সুনয়নী শোবার পর অন্ধকার ঘরে তাঁর হাতের চুড়ির, চাদরে পা ঘষার, পাশ ফেরার এবং ঈশ্বরনাম করার বিড়বিড় শব্দ হলো।

তারপর নিস্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা গাঢ় হয়ে আসার পর সুধাকান্ত মৃদু গলায় বললেন, "তুমি একটা ফেয়ারওএল দেখলে, সুনু ; শেষেরটা কেমন হবে তা দেখবে না ?...আমি তো তাই ভাবছি।"

সুনয়নী তাঁর বয়সের হাত স্বামীর মুখের কাছে এনে ঠোঁট চাপা দিলেন।...

অনেকটা রাত হয়ে এলেও সুধাকান্তর ঘুম আসছিল না। সুনয়নী অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। সুধাকান্ত অনুভব করতে পারছিলেন : গোলগাল, সামান্য খাটো শরীরটা সুজনীর মধ্যে ঢেকে আলগা-বসনে সুনয়নী পাশ ফিরে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। মাঝে মাঝে নিশ্বাসের

দীর্ঘ শব্দ উঠছে। জেগে থেকে থেকে ঘুম না আসায় খানিকটা অবসাদ বোধ করছিলেন সুধাকান্ত, হাই উঠছিল, তন্দ্রার আবেশ এসেও চলে যাচ্ছিল। শোয়ার পর পরই পাতলা ঘুম এসেছিল তাঁর, হয়তো ঘুমিয়েও পড়তেন, আচমকা সুনয়নী গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলেন ঃ "শুনছ ?"···সুধাকান্ত শুনলেন, বড় রাস্তা দিয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে কারা চলে যাচ্ছে। অগ্রহায়ণের প্রায়-নিস্তব্ধ রাত্রে মৃদু অথচ সমস্বরে আবৃত্ত হরিধ্বনির সেই গুঞ্জন দীর্ঘক্ষণ কানে লেগে থাকল। সুনয়নী অন্ধকারেই করজোড়ে নমস্কার সেরে বললেন, "এরা বেশ সভ্যভব্য ভাবে যাচ্ছে, নয়তো যা সব্ যায়···," বলে স্বামীর গা স্পর্শ করে শুয়ে থাকতে থাকতে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

সুধাকান্তর পাতলা ঘুম প্রথম দিকে সেই যে কেটে গেল, তারপর থেকে জেগেই আছেন ; মাঝে মাঝে নেশার মতন একটা জড়ানি আসছে, আবার কেটে যাচ্ছে। ঘুম না আসায় নানারকম কথা মনে আসছিল। অফিসের কথাটাই বেশি যেন ঃ বিপিনবাবু তাঁর চেয়ারটা পেলেন, ভালই হয়েছে ; তারাপদর খানিকটা অসুবিধে হবে বিপিনবাবুর ধাঁচ বুঝতে, অবশ্য বুঝে যাবে, তারাপদ বেশ চটপটে ; কাশীনাথের প্রমোশনের জন্যে যা করার সুধাকান্ত করে এসেছেন, এখন তার বরাত ; গুহসাহেবকে সৎপরামর্শই দিয়ে এসেছেন সুধাকান্ত, শুধু নিজের জেদ ছেড়ে গুহসাহেব যদি মিলেমিশে চলতে পারেন তাহলেই মঙ্গল। বর্তমানের এইসব চিন্তা স্বাভাবিকভাবে তাঁর মনে ভাসছিল এবং কোনো কোনো স্মৃতি যেন মনের গভীর থেকে জলোচ্ছ্বাস ঘটিয়ে উঠে এসে তাঁকে অতীতে টেনে নিচ্ছিল। সেই একেবারে ছোকরা বয়সে প্রথম যেদিন অফিসে ঢুকলেন, পকেটের রুমালে মা'র দেওয়া আশীর্বাদী ফুল ছিল, মুখ মোছার সময় শুকনো ফুলটা অফিসের কলঘরে পড়ে যাওয়ায় কীরকম মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে! প্রথম দু'চারদিনের মধ্যেই তাঁর শখের কলম খোওয়া গিয়েছিল, নোয়াখালির গণপতি দত্তর সঙ্গে ভাব হয়েছিল,

গণপতি তাঁকে ফিটনে চাপিয়ে মাঠে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়ে ছিল আর প্রাণের কথা বলেছিল যত রাজ্যের।…দেখতে দেখতে সুধাকান্ত অফিসে পুরনো হয়ে গেলেন; দু'তিন বছরের মধ্যেই সব নিজের কাছে অভ্যস্ত, পুরনো স্বাভাবিক হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল সুধাকান্তর, অফিসের বন্ধু তুলসী মিত্তির কোথা থেকে এক ছবি এনে মা'র কাছে হাজির করল। মা বললে, 'বেশ মেয়েটি'। ছবি দেখে সুধাকান্ত তুলসীকে বলেছিলেন, 'এ যে একেবারে দুধের সর রে, কে হয় তোর?' তুলসী বলেছিল, 'সম্পর্কে বোন। তোর অপছন্দ হবে না।'…সুধাকান্তর অপছন্দ হয়নি, তবে ছবি দেখে, একেবারে নরম, বোকা-বোকা, ছেলেমানুষ মনে হয়েছিল। বিয়েটা হয়ে গেল, মা'র ভারী পছন্দ হয়েছিল সুনয়নীকে। তারপর যা হয়—মা'র হাতে তৈরী অফিসের ভাত খেয়ে, আর সুনয়নীর পরিপাটি করে গুছিয়ে দেওয়া টিফিনের বাক্স পকেটে পুরে অফিস আর বাড়ি করতে করতে সুধাকান্ত পুরোদস্তুর গার্হস্থ্য প্রাণী হয়ে গেলেন। সুনয়নী কিছুটা ভাগ্য নিয়ে এসেছিলেন নিশ্চয়, সুধাকান্ত বেশ তাড়াতাড়ি অফিসের অনেকের নজরে পড়ে যাচ্ছিলেন। অল্পে অল্পে উন্নতি শুরু হলো। সুনয়নী ভাগ্যমন্ত হলেও সুধাকান্ত নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; উন্নতির জন্যে তাঁর নিরলস পরিশ্রম ছিল; ব্যবহারে আলাপে সুধাকান্ত সহিষ্ণু, নম্র ও শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। ওই বয়সেই তিনি অফিসে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আদায় করতে পেরেছিলেন। তবু, এটা হয়তো ঠিক, উন্নতির প্রতি তাঁর কেমন একটা চাপা আকাঙ্ক্ষা ছিল, এবং দিনে দিনে সেটা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। বড় একটা উন্নতির মুখে মা মারা গেলেন। বাবা কৈশোরেই গেছেন। মনে মনে আফসোস থাকল; কিন্তু মা মারা যাবার আগেই সুধাকান্ত পায়ের খুঁটি শক্ত করে ফেলেছিলেন। ছেলে সম্পর্কে মা'র অন্য কোনো দুঃখ ছিল না, থাকার কথাও নয়; একটিমাত্র দুঃখ মা'র বুকে কাঁটার মতন বিঁধে ছিল যা, তা পারিবারিক দুঃখ; মা নিঃসন্তান দেখে গিয়েছিলেন ছেলেকে। সুধাকান্ত এবং সুনয়নী

তখনো নিঃসন্তান। মা মারা যাবার পর সুনয়নীকে বড় একা ও অবলম্বনহীনের মতন থাকতে দেখে সুধাকান্ত তাঁর আত্মীয় সম্পর্কের এক বোনের একটি মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। বিনু। বিনুর তখন বাচ্চা বয়েস, বিনুর মা রুগ্ন, হাসপাতালে যাবে, স্বামী মারা গেছে। বিনুকে তখন থেকেই সন্তানের মতন করে মানুষ করেছেন সুনয়নী। সন্তানের আশা সুধাকান্তরা ছেড়েই দিয়েছিলেন। প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবেই কিছুটা বয়সে সুনয়নীর গর্ভে সন্তান এল; সুধাকান্ত তখন চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছেন। আজ খোকার বয়েস কুড়ি-একুশ। নিজের সন্তান আসা সত্ত্বেও সুনয়নী বিনুর প্রতি সমান অনুরাগী ছিলেন, সমান কর্তব্যপরায়ণ; বিনু আর খোকা এখন পর্যন্ত তাদের সম্পর্কের পলকা ভাবটা বোঝার চেষ্টা করেনি, বরং সেটা তারা মূল্যবান বলে মনেও করে না। বিনুকে সুধাকান্ত শুধু প্রতিপালন করেননি, মেয়ের যত্নে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, নিজে পাত্র পছন্দ করে বিয়ে দিয়েছেন। বিনুর সেই মা কবে কোন যুগে বিগত হয়েছে তা আর মনেও পড়ে না।···সংসারের দিক থেকে সুধাকান্ত শোক দুঃখ, অশান্তি উদ্বেগ ভোগ করেননি প্রায়, মনে মনে যেটুকু অভাব বোধ করতেন, এক সময় তারও পূরণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বা সুনয়নী এদিক থেকে সুখী মানুষ, তৃপ্ত মানুষ। হয়তো ভাগ্যবান মানুষই।

পুরনো এই সব -কথা এবং আরো পাঁচরকম কথা সুধাকান্তর মনে পড়ছিল। বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে—যেন কোনো অসংলগ্ন স্বপ্ন ছুটে যাচ্ছে—সুধাকান্ত নিজের জীবনের এইসব দৃশ্য ভাবছিলেন, দেখছিলেন, হারিয়ে ফেলছিলেন। ক্রমশই কখনো কখনো এক একটি স্মৃতি কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। মনে পড়ল, সুনয়নীকে একবার তিনি গঙ্গার ঘাটে প্রায় ডুবিয়ে ফেলেছিলেন, আঘাটায় স্নান করতে নেমে স্ত্রীকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন আর কি! অফিসের পুরনো চিন্তার মধ্যে থেকে প্রমথেশের স্মৃতিও উজ্জ্বল হয়ে

উঠল। মাথা-পাগলা ছেলে, অফিসে দুপুরবেলায় রেকর্ডরুমে ঢুকে আত্মহত্যা করেছিল। আত্মহত্যার আগে তার মাথায় একটা খেলা ভর করেছিল, অফিসের নানাজনের কাছে সাদা কাগজের চিট্ পাঠাত, তাতে লিখত : 'প্লিজ অ্যাপ্লাই ফর ইওর সেফটি অ্যাণ্ড সিকিউরিটি···।' কোথায় যে দরখাস্ত পাঠাতে হবে তা অবশ্য লেখা থাকত না। সুধাকান্তও একবার এরকম চিরকুট পেয়েছিলেন। ওকে ডেকে পাঠিয়ে ধমক দেবেন ভেবেও শেষ পর্যন্ত কিছু করেননি, ছেলেটিকে অসুস্থ মনে হয়েছিল। কয়েকদিন পরে দুপুরবেলায় রেকর্ডরুমে ঢুকে প্রমথেশ আত্মহত্যা করে। ওর গলায় একটা নামাবলী মাফলারের মতন জড়ানো ছিল।

প্রমথেশের মুখ এখন আর ভাল করে মনে পড়ল না সুধাকান্তর, ঘটনাটা মনে পড়ল। মনে পড়ল, যুদ্ধের মাঝামাঝি এক বর্ষার দিনে অফিসে পুলিশ এসে দ্বিজেন সামন্তকে গ্রেপ্তার করেছিল, দ্বিজেন অগস্ট রেভলিউসানের সঙ্গে জড়িত ছিল গোপনে।

পুরনো ঘটনা থেকে মন আবার দমকা বাতাসে ওড়া পাতার মতন উড়ে উড়ে বর্তমানে এল। বিনুর স্বামীর নামও দ্বিজেন। মেয়ে-জামাই সুধাকান্তদেব বার্নপুরে নিয়ে গিয়ে দু-একমাস রাখতে চায়। সুধাকান্তর তেমন কোনো ইচ্ছে নেই যেতে। বিনুর সঙ্গে কথা বলে দেখবেন কাল, কি বলে বিনু।

সুনয়নী অঘোর ঘুমে। সুধাকান্তর ইচ্ছে হলো, স্ত্রীকে জাগিয়ে দেন। বয়সকালে স্ত্রীকে ঘুমের মধ্যে জাগিয়ে তোলার কয়েকটা কলাকৌশল তিনি নিজে নিজে আবিষ্কার করেছিলেন, যেমন সুনুর নাকের কাছে নিজের নাক রেখে বড় বড় নিশ্বাস ফেললে সুনু তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট পেয়ে জেগে উঠত, কিংবা ভিজে জিব সুনুর নাকের ডগায় রাখলে সুনু সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠত, কারণ তার মনে হতো মুখে টিকটিকি পড়েছে; টিকটিকির বড় ভয় ছিল সুনুর। এসব কৌশল এ বয়সে আর শোভন নয়, সুধাকান্ত অথবা সুনয়নী কেউ আর সেই

বয়সের তাপ ও সুখ এখন নাক বা জিবের স্পর্শে অনুভব করতে পারেন না, ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণ অনুভূতিগুলি এখন ওপরে ওপরে তীব্র নয়, বরং সমস্ত কিছু যেন ভেতরে কোথাও শিকড় ছড়িয়ে প্রসারিত হয়ে আছে। স্ত্রীকে জাগাতে হলে সুধাকান্ত এখন হয়তো জল খেতে চাইবেন, বা মাথার দিকে জানালা বন্ধ করতে বলবেন, কিংবা রাত্রের অস্বস্তির জন্যে একটা ওষুধ দিতে বলবেন।

সুধাকান্ত প্রায় অন্যমনস্কভাবেই সুনয়নীর মাথার দিকে হাতটা সরিয়ে দিলেন, স্ত্রীর মাথার চুল, গাল তাঁর আঙ্গুল স্পর্শ করল। এই স্পর্শ তাঁর ঠিক অভিপ্রেত ছিল না, কিন্তু স্পর্শের পর তিনি মমতা ও স্বস্তি অনুভব করলেন। অন্ধকারেই তাঁর কেমন মনে হলো, তিনি সুনুর সাদা চুলে হাত দিয়েছেন। সুনুর গাল এখন বেশ পুরু, সামান্য খসখসে। আগে সুনুর গালে দাঁতের দাগ লাগলে নীলচে কালশিটে পড়ত, সুনু লজ্জা পেত, সেসব দাগ কতকাল আর পড়ে না। জীবনের এই দিকটা কেমন যেন একটা বাঁকা সেতুর মতন সেই যৌবনে শুরু হয়েছিল, তারপর ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আবার আস্তে আস্তে নেমে এল এই বৃদ্ধ বয়সে, এখন সেতুর শেষ।...এরপর ?

এরপর কি—সুধাকান্ত অনুভব করার এবং বোঝার চেষ্টা করলেন না। তাঁর হঠাৎ সুনয়নীর কথাটা আবার মনে পড়ল: 'তোমায় সবাই ভালবেসে কত দিয়েছে, আমি যখন যাব, তখন কিছু দিও।'... কথাটা থেকে থেকে তখন থেকেই তাঁর মনে আসছে, চাপা অসুখের মতন ভেতরে যে একটা অস্বস্তি হচ্ছে, তাও তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করছেন। অথচ তিনি সুনয়নীকে কিছু দেবার কথা তেমন ভাবছেন না, বরং বহুক্ষণ থেকে অন্য একটা কথা ভাবছেন, সন্ধ্যে থেকেই প্রায়, কিংবা সেই অফিস থেকেই ফেয়ারওএলের পালা ফুরোবার পর থেকেই। সুনয়নীর কথা, সুনয়নীর প্রার্থনার সঙ্গে তার হয়তো কোনো সম্পর্কও আছে। কে জানে!

সুধাকান্ত স্ত্রীর মাথায় হাত রেখে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুমের মধ্যে সুধাকান্ত তাঁর ফেয়ারওএলের স্বপ্ন দেখছিলেন। দেখছিলেন, অফিসের নীচের তলার হলঘর ভিড়ে ভরে গেছে, চেয়ারগুলো ভরতি হয়ে যাওয়ায় হলঘরের পেছনে এবং পাশে দেয়াল ঘেঁষে অনেকে দাঁড়িয়ে, সুধাকান্তর সামনে চাদর-বিছানো লম্বা টেবিল, ফুলের তোড়া আর মালা, উপহারের নানান জিনিসে টেবিলটা ভরে রয়েছে, সুধাকান্তর দু'পাশে কিছু চেয়ার, বড় বড় অফিসাররা বসে আছেন। বেশ কিছুক্ষণ যে ফেয়ারওএল চলছিল এবং এতক্ষণে শেষ হয়ে আসছে সুধাকান্ত তা অনুভব করতে পারছেন: বক্তৃতা, অভিনন্দনপত্র পাঠ—এসব শেষ হয়েছে, উপহার দেওয়াও শেষ, এখন শুধু সুধাকান্তকে কিছু বলতে হবে, সকলেই অপেক্ষা করছে। সুধাকান্ত সামনের দিকে তাকালেন: হলঘরের থামের আড়াল মাঝে মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও সিলিং থেকে ঝোলানো আলোয় তিনি যেন সমবেতদের দেখতে পাচ্ছিলেন। ঘরের মধ্যে গুঞ্জন ও অস্পষ্ট কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে, ওরা কিছু শোনার জন্যে অধৈর্য, হয়তো সামান্য উত্তেজিত; সুধাকান্তর বিদায়-সম্ভাষণ শোনার জন্যে ব্যগ্র বোধ হয়। এত সমাদর, প্রীতি, শুভেচ্ছার পরিবর্তে সুধাকান্ত যে কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তিনি যে বেশ অভিভূত, গভীর কোনো তৃপ্তি এবং এই বিদায়কালীন বেদনায় বিহ্বল হয়ে আছেন—এ কথা ওরা হয়তো বুঝতে পারছে না।

সুধাকান্ত উঠে দাঁড়ালেন। তিনি উঠে দাঁড়াবার পর মনে হলো, ঘরের মধ্যে যে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছিল তা নিম্নস্বর হতে হতে শান্ত হয়ে আসছে। সুধাকান্ত অভিভূত থাকায় তাঁর গলায় স্বর ফুটছিল না। আড়ষ্ট ভাবে গলা পরিষ্কারের চেষ্টা করতে করতে তিনি মনে মনে কয়েকটা কথা সাজালেন, কি ভাবে সম্বোধন করবেন সকলকে, 'ভদ্রমহোদয়গণ' না 'প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ', এ নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় পড়লেন। শেষেরটাই তাঁর কাছে ভাল লাগল। কাঁপা, জড়ানো, অভিভূত-স্বরে তিনি কথা শুরু করলেন। সামান্য কয়েকটা কথা, যা নিতান্তই

ভূমিকা, স্পষ্ট করে যা শোনাও গেল না, সুধাকান্ত বলেছেন কি সবটা বলেনও নি, হলঘরের পেছনের ভিড় নড়তে লাগল। ওখানে নড়াচড়া শুরু হওয়ার পর দেখা গেল, ক্রমশই হলঘরের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো ভিড়টাও নড়াচড়া শুরু করেছে, কারা যেন পা ঘষে ঘষে বেরিয়ে যাচ্ছে, তারপর একে একে সবাই নড়তেচড়তে এগুতে এবং অন্যকে পাশ কাটিয়ে বাইরে চলে যেতে লাগল। সুধাকান্তর এটা পছন্দ হলো না, ভাল লাগল না। কেন ওরা চলে যাচ্ছে সুধাকান্ত বুঝতে পারলেন না, অবাক এবং ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করে গেলেন। যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে ছিল, শেষ সময় তাদের অধৈর্যভাব তাঁকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করছিল।…অকস্মাৎ তাঁব মনে হলো, হলঘর ছেড়ে যারা চলে যাচ্ছে তারা বোধ হয় দুর্বলতা বোধ করছে, সুধাকান্তর এই বিদায়-ভাষণ ওদের কাতর করছে। কোনো বড় দুঃখ বা অ-সহ্যের কাছ থেকে এভাবে অনেকে সবে যায়। সুধাকান্ত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সম্ভবত সামান্য অপেক্ষা কবার অনুবোধ করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলেন, চেয়ারগুলোও খালি হতে শুরু করেছে, সিনেমা থিয়েটারের শো ভাঙার মতন সবাই উঠে দাঁড়িয়ে একে অন্যকে ঠেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা কবছে, দরজার কাছাকাছি চাপাচাপি ভিড়।… কী আশ্চর্য! সুধাকান্ত নির্বাধের মতন তাকিয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। না, এবা দুর্বলতাবশে দলে দলে সুধাকান্তকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে না, সেটা সম্ভব না। তবে? তবে যে কি—সুধাকান্ত ভেবে পাচ্ছিলেন না। বিমূঢ় হয়ে লক্ষ করলেন, ক্রমশ হলঘর শূন্য হয়ে এল, শেষ দলটাও বেরিয়ে চলে গেল। তারপর আশেপাশে আর কেউ কোথাও নেই, সিলিং থেকে ঝোলানো বাতিগুলো জ্বলছে, ঘরে একটিও প্রাণী নেই, শূন্য পরিত্যক্ত আসনগুলো এলোমেলো পড়ে আছে। মনে হচ্ছিল, সবাই তাঁকে ফেলে রেখে বা পরিত্যাগ করে চলে গেছে, তিনি একা, একেবারে নিঃসঙ্গ। আর এই সময় হলঘরের বাতিগুলো একে একে নিবে গিয়ে এখানে ওখানে সেখানে অন্ধকার

ছড়াতে লাগল। শেষে মনে হলো, চার পাশ থেকে অন্ধকার আসছে, যেন কালো কোনো মেঘ ভাসতে ভাসতে চলে আসছে। অন্ধকার একেবারে কাছাকাছি এলে সুধাকান্ত ভীত বোধ করলেন, এবং দেখতে দেখতে হাতের নাগালেব মধ্যে অন্ধকার পৌঁছে গেলে অতীব আতঙ্ক বোধ করে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। ঠিক যে কি হলো অনুভব করাও গেল না, মনে হলো চারপাশের অন্ধকার তাকে বেড় দিয়ে ঘিরে ফেলেছে, ঠিক যেন কাঠগড়ার চৌহদ্দির মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে, আশেপাশে সামনে কেউ কোথাও নেই।

এই বিশ্রী অবস্থাটা তাঁর শ্বাস রোধ করে আনছিল। সুধাকান্ত ভীত, উদ্বিগ্ন, বিচলিত এবং বিরক্ত। এসব কি? এখানে তিনি আসেননি, আসতেও চাননি; বুঝতেই পারছেন না—কেন তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি ফেয়াবওএল নেবার জন্যে অফিসেব মস্ত হলঘরে এসেছিলেন, সেখানে দীর্ঘদিনের সহকর্মীবা ছিল, আলো ছিল, ফুল ছিল, উপহার ছিল। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এটা সে জায়গা নয়, এখানে ফেয়ারওএল নিতে তিনি আসেননি, এ জায়গাটা তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অস্বস্তিকর জায়গা।

সুধাকান্ত অত্যন্ত বিরক্ত ও অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আচমকা সেই শূন্য ঘরে অন্ধকারে হাস্যরোল উঠল। সে রোল যেন থামে না, ফাঁকা হলঘরের বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এটা উপহাসের অট্টহাস্য, নাকি অন্য কিছু! সুধাকান্ত ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর সুধাকান্ত দেখলেন, তিনি আর ঘরে নেই, ফাঁকা মাঠে, মাঠ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সুনয়নীকে দেখতে পেয়ে গেলেন। সুনয়নী ছেলেমানুষের মতন আঁচলে পুঁটলি বেঁধেছে। সুধাকান্ত বললেন, 'এসব কী?' সুনয়নী হেসে হেসে জবাব দিলেন, 'তোমার ফেয়ারওএলের পাওনা গো, কর্তা। ইস্, তোমায় ভালবেসে ওরা কত কি দিয়েছে!' এই বলে সুনয়নী আঁচলের

পুঁটলি খুলতেই কোথাও কিছু চোখে পড়ল না, যেন বাতাস বেঁধে রেখেছিলেন সুনয়নী, বাতাসেই মিশে গেল শূন্যে।

সুধাকান্তর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর অচেতনের মতন তিনি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেন। নদীর জলে ডুব দিয়ে মাথা তোলার পরও যেমন মনে হয় জলে ডুবে আছি, কিছুক্ষণ সেই অনুভূতিটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকে, স্বপ্নটাও সেইভাবে তাঁব চোখে ও মনে জড়িয়ে থাকল। সামান্য পরে সুধাকান্ত স্বপ্ন ও নিজেকে পৃথক করতে পারলেন, কিন্তু কিছুতেই সেই পরিত্যক্ত শূন্য হলঘর এবং একে একে বাতি নিবে যাবার দৃশ্যটি চিন্তা থেকে তফাতে রাখতে পারলেন না। আব এখন, জেগে উঠেও তাঁর কেমন যেন মনে হচ্ছিল, চার পাশ থেকে অন্ধকার এসে তাঁকে ঘিরে ধবেছে, কাঠগড়ার চৌহদ্দির মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

সুনয়নী অঘোর ঘুমে। সুধাকান্ত তৃষ্ণা অনুভব করছিলেন। স্ত্রীকে ডাকবার ইচ্ছে হচ্ছিল, তবু ডাকলেন না। অশান্ত মনে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে বাতি জ্বাললেন, উজ্জ্বল আলোটা চোখে লাগার সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়ে দিলেন, দিয়ে ফিকে মৃদু নীলাভ আলোটা জ্বেলে দিলেন। জল রাখা ছিল, জল খেয়ে, সিগারেট ধরিয়ে দবজা খুলে বাথরুমে চলে গেলেন।

ফিরে এসে সুধাকান্ত আর বিছানার দিকে গেলেন না, হালকা চাদরটা গায়ে জড়ালেন। বাতি নেবাবার সময় ফেয়ারওএলের উপহারগুলো তাঁর চোখে পড়ল। ঘড়ির পাখিটা আরো কয়েক ঘর চলে গেছে।

ঘর অন্ধকার করে সুধাকান্ত আর্ম-চেয়ারে এসে বসলেন। আস্তে আস্তে অলসভাবে সিগারেট খেতে খেতে তিনি ঠাণ্ডাটা অনুভব করলেন সামান্য ; এখন প্রায় শেষ রাত, ঠাণ্ডা পড়েছে, হিম ও শিশিরের আর্দ্র ভাবটা যেন ঠাণ্ডায় মেশানো। সুধাকান্ত জানলাব দিকে তাকিয়ে থেকেও কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না ; অন্ধকারে অতি অস্পষ্ট একটা

আভাস ফুটে আছে, বাইরে কোথাও চাঁদ ডুবে গেছে না শেষরাতে উঠে এসেছে বোঝা যায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুধাকান্ত, বুকের কোথাও ভার জমে আছে, ফুলে থাকার মতন কেমন এক বেদনা। স্বপ্নটা তাঁকে এখনো বিব্রত করছে, রাত্রের অন্ধ মাছি যেন ; তাড়িয়ে দিলেও আবার মুখে এসে বসছে।

অফিসের ফেয়ারওএলটা যে তাঁকে সন্দিগ্ধ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রথমাবধি সুধাকান্ত এটা অনুভব করেছেন, অস্পষ্টভাবে তাঁর মনে হয়েছে, এটা কি যথার্থ? তবু, অত সমাদর, বহুজনের প্রশংসা, প্রীতিবচন, সহকর্মীদের অনুরাগ তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি অভিভূত হয়েছিলেন, মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু কেন যেন তাঁর মনের কোথাও একটা অদ্ভুত চঞ্চলতা এসেছিল, এটা কি তাঁর প্রাপ্য? যথার্থই কি তিনি এসব পেতে পারেন? তখন, সেই বিদায়-অনুষ্ঠানেব মঞ্চে বসে রাজ-সমাদর পেতে, নিজের প্রশস্তি শুনতে তাঁব শুধু ভাল লাগেনি, স্বাভাবিকভাবেই আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। এক এক সময় তিনি বিশ্বাস করে নিচ্ছিলেন, ওরা—তাঁর সহকর্মীরা যা বলছে, সব সত্য। হয়তো আরো একটু বেশী পেতে বা শুনতে তাঁর বাসনা হচ্ছিল। কিন্তু সাময়িকভাবে এই ঘোর থাকলেও, প্রায়শঃই তা কেটে যাচ্ছিল এবং গোপন কোনো বেদনার অনুভবের মতন মনে হচ্ছিল, এ কি যথার্থ?

সুধাকান্ত যেন একটা নেশার মধ্যে ছিলেন বহুক্ষণ, সেই অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত এই নেশা তাঁকে স্পষ্ট করে বুঝতে দিচ্ছিল না, কিসের কাঁটা মনের মধ্যে বিঁধে গিয়েছে। অথচ এ নেশা তাঁকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, ফলে মাঝে মাঝে কোনো গোপন স্থান থেকে একটা অস্বস্তি উঠে আসছিল। সাময়িক-ভাবে এসে আবার চাপা পড়ছিল। বাড়ি ফিরে আসার পর ক্রমশ আচ্ছন্নতার ভাবটা কাটতে লাগল। বিনু আর খোকা তর তর করে নীচে নেমে গিয়ে অফিসের গাড়ি থেকে জিনিসগুলো সব কোলে করে

তুলে আনল; সুনয়নীকে হাঁকডাক করে ঘরে নিয়ে এল, এনে ছেলে-মেয়ে আর মায়ে মিলে সুধাকান্তর পাওয়া জিনিসগুলো দেখতে লাগল। ছেলেমেয়ের সামনে সুনয়নী বড় একটা কথা বলছিলেন না, মুখটা শুধু হাসি-খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ছিল। বিনু আর খোকা এমন হইচই করছিল যেন তাদের বাবা মস্ত একটা ট্রফি জিতে এনেছে। বিনু মুখে মুখে একটা হিসেব তৈরি করছিল, কত টাকার জিনিস পাওয়া গেছে; খোকা টাকার হিসেবটা তেমন দেখছিল না, জিনিসগুলো কোথায় কিভাবে সাজিয়ে রাখলে লোকের চোখে পড়বে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। অভিনন্দনপত্রটা সে জোরে জোরে পড়ে তার মা ও দিদিকে শোনাল, তারপর হেসে বলল যে, এমন ভাষা দিয়ে লিখেছে কিছু মানেই হয় না···। সুধাকান্ত কাউকে কিছু বলেননি, কিন্তু মনে মনে ক্ষুণ্ণ ও পীড়িত হচ্ছিলেন। তাঁর অভিভূত ভাবটা আর ছিল না, নেশা বা আচ্ছন্নতা কেটে আসছিল। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন, ছেলে-মেয়েরা সমস্ত জিনিসটাকে অন্য চোখে দেখছে, কত পাওয়া গেল, কত লাভ হলো, কি ভাবে লোকের চোখে এই জিনিসগুলো দেখানো যাবে —এই সবই তাদের চিন্তা। বাবার জন্যে যে তাদের খানিকটা অহংকার প্রকাশ না পাচ্ছিল এমন নয়, তবু ওটা তেমন ধর্তব্যের নয় বলে সুধাকান্তর মনে হচ্ছিল। আসলে ওরা পাওনা দেখছিল, পাওয়ার ইতিহাস দেখছিল না। সেটা বরং সুনয়নী দেখেছেন; সুনয়নী দেখেছেন, বুঝেছেন; হয়তো তাই বলেছেন: 'তোমায় সবাই ভালবেসে কত দিয়েছে।'

সুধাকান্ত কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন, তিনি যা পেয়েছেন তার বড় একটা মূল্য নেই। পাওনাগুলো সাংসারিক, পাওয়ার ইতিহাসটাও যথার্থ নয়। সহকর্মীদের তিনি ছোট করতে চাইছেন না, বা তাদের এই উপহারকে অবজ্ঞা করতেও তাঁর বাধছে, তবু এটা ঠিক—সুধাকান্ত অনেক মিথ্যা স্তুতি এবং শখের ভালবাসা নিয়ে এসেছেন।

কথাটা মনে আসায় নিজের রূঢ়তার জন্যে তাঁর অস্বস্তি হলো। মনে হলো, এটা ঠিক হয়নি ; হয়তো এই বিদায়-সম্ভাষণের অনেকটাই আন্তরিক। অফিসে আরো অনেক ফেয়ারওএল হয়েছে, সুধাকান্তর মতন এমন সমাদর আর কেউ কি পেয়েছে ? দু-একজনকে মনে পড়ল যাদের সঙ্গে তিনি নিজের ফেয়ারওএল-এর তুলনা করলেন। করে দেখলেন, তিনি হেরে যাচ্ছেন। ঘোষ সাহেবকে এয়ারকুলার, হীরের আঙটি দেওয়া হয়েছিল, অন্যান্য জিনিসও অঢেল। এয়ারকুলার আর হীরের আঙটির টাকা দিয়েছিল কলকাতার দুই নামকরা স্টিভেডার। কেন দিয়েছিল ?

সুধাকান্তর লজ্জা হলো, গ্লানি হলো। ঘোষসাহেব বরাবর দেনা-পাওনা বজায় রেখে কাজ করে গেছেন। অন্যকে তিনি সুযোগ দিতেন, নিজেও নিতেন। সাহেব সকলের কাছেই সেজন্যে পছন্দসই ছিলেন। অথচ মানুষটির চরিত্র সুধাকান্ত খানিকটা না জানেন এমন নয়। অনেকেই জানত। ফেয়ারওএলের সময় কোথাও কিন্তু তার উল্লেখ ছিল না। বরং বিগলিত প্রশংসা উঠেছিল পঞ্চমুখে।

সুধাকান্ত এতক্ষণে স্পষ্ট করেই বুঝলেন, আজ তাঁর সম্পর্কে যেসব প্রশংসা করা হয়েছে তার অনেকটাই মিথ্যে। ঘোষ সাহেবের বেলায় যেমন হয়েছিল তার সঙ্গে ইতরবিশেষ তফাত হতে পারে এই মাত্র। অভিনন্দনপত্রটাকে একেবারে পোশাকী মনে হচ্ছিল, বাজারে বিকোনো বিয়ের পদ্যর মতন, সর্বত্রই চলে, শুধু নামটা বদলে দিলেই যথেষ্ট। খোকা ছেলেমানুষ হলেও ঠিক বলেছে ; ওটা নিতান্ত কতকগুলো গালভারী কথার সমষ্টি। মেয়েদের হাতে একরকম বালা থাকে বলে শুনেছেন সুধাকান্ত, যার ভেতরটা গালায় ভাত ; এতে ফাঁপা ভাবটা নষ্ট হয়। সুধাকান্তর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলো না, তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের কর্মজীবনের—যেখানটা ফাঁপা, কৃত্রিম, অন্তঃসারহীন—সেখানটা সহকর্মীরা গালা দিয়ে ভরতি করে দিয়েছে। এটাই রেওয়াজ, ভদ্রতা, সৌজন্য।

নিজের সম্পর্কে নিজে পরিহাস করার মতন সুধাকান্ত কয়েকটা সুন্দর সুন্দর কথা মনে করলেন, যা আজ বিকেলে ফেয়ারওএলের সভায় শুনেছেন। মন্মথবাবু গীতার কর্মযোগের দৃষ্টান্ত তুলে সুধাকান্তকে একেবারে কর্মযোগী করে তুলেছিলেন। গুণগান গাইতে গাইতে কত গলা ভারী হয়ে গিয়েছিল। ছোকরাদের তরফ থেকে অবনীশ বেশ কাব্যময় ভাষায় তাঁকে, নাকি তাঁর অন্তরকে, আকাশের মতন নির্মল উদার বলে বর্ণনা করেছিল। এখন এসব কথা মনে পড়লে হাসি পাচ্ছে।

সুধাকান্ত নিজে জানেন, তিনি কি। নিজের অধ্যবসায়, পরিশ্রম, কর্মক্ষমতা, ব্যবহার-রীতি, ধৈর্য, সহানুভূতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিষ্কার। সাধারণ কেরানী থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি চড়েছেন, বড় হয়েছেন। একেবারে অযোগ্য তিনি নন; তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং নিরলস পরিশ্রমের জন্যে তাঁর অহংকার স্বাভাবিক। কিন্তু সুধাকান্ত জানেন, তিনি অতিশয় চতুর এবং বুদ্ধিমান ছিলেন; নিজের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর প্রখর চোখ ছিল না। এক একটি সিঁড়ি শেষ করে তিনি পরবর্তীর জন্যে তৈরি হতেন। তাঁর সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল গোপনে, ধরা পড়ার ভয় প্রায় ছিল না। কিছু বিশ্বস্ত লোক তিনি রেখেছিলেন, যারা তাঁর রথ টানত। এদের তিনি সাধ্যমত প্রতিদান দিয়েছেন। আজ তিনি বার বার তাঁর সাধুতা ও উদারতার প্রশংসা শুনেছেন। তিনি নাকি অত্যন্ত সৎ, নীতিনিষ্ঠ, দৃঢ়চরিত্র।···আশ্চর্য, সুধাকান্ত এর কোনোটিই নয়। ওরা যেভাবে বলেছে সেভাবে নয়। ঘোষসাহেবের তুলনায় সুধাকান্ত সৎ বা সাধু হতে পারেন; ঘোষসাহেব হীরের আঙটি পেয়েছেন, সুধাকান্ত সস্তায় জমি নিয়েছেন। হ্যাঁ, জনৈক ব্যক্তিকে খানিকটা সুযোগ-সুবিধে করে দেওয়ার পরিবর্তে তিনি আট হাজার টাকা কাঠার জমি চার করে নিতে পেরেছেন। তিনি সৎ বা সাধু হলে লোকটার আদালতে যাবার কথা। সময়বিশেষে এবং

ছোটখাটো বিষয়ে তিনি সৎ থেকে তাঁর সাধুতার বিজ্ঞাপন প্রচার করেছেন, বেশির ভাগ মানুষ যা করে, কিন্তু বড় জায়গায় তিনি যথারীতি অসৎ। তিনি যদি সৎ তবে শশিকান্ত হাজরার নামে অকারণ একটা কলঙ্ক রটল কেন? কেন বেচারী শশিকান্ত অপবাদ আর দুর্নাম নিয়ে অফিস থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেল! না, তিনি নীতিনিষ্ঠও নন, সুযোগ-সুবিধে মতন তিনি নীতি আঁকড়ে থেকেছেন, অসুবিধেয় পড়লে ছেড়ে দিয়েছেন। আজ ফেয়ারওএলে যাবার আগে হলঘরের মুখে মলিনার সঙ্গে দেখা হলো। মলিনা আজ আঠারো-বিশ বছর এই অফিসে চাকরি করছে। যখন প্রথম এসেছিল তখন তরুণী, বছর উনিশ-কুড়ি বয়স, টাইপিস্ট-এর চাকরি নিয়ে ঢুকেছিল; এখন মলিনার বয়স প্রায় চল্লিশ হতে চলেছে, বিবাহিতা মেয়ে, বাড়িতে দু-তিনটি ছেলেমেয়ে, স্বামী অন্য অফিসের কেরানী। মলিনাকে আজ ভারিক্কি, সাদামাটা, ক্লান্ত দেখায়; তখন এরকম দেখাত না, ময়লা রঙে কেমন একটা টান ছিল, গড়নে দপদপে ভাব ছিল, চোখে চটুলতা। সুধাকান্তর কাছে টাইপের জন্যে মলিনাকে দেওয়া হয়। সুধাকান্ত একটা মাসও ওকে রাখেননি। কেন রাখেননি সুধাকান্ত জানেন, আর জানে মলিনা। টাইপের অজস্র ভুল সেদিন মলিনা কেন করেছিল সুধাকান্ত জানেন, অথচ কি রকম একটা ঈর্ষাবশে মলিনাকে তিনি তাঁর কাছ থেকে তাড়িয়ে দিলেন; বেচারী সুনীল, সুধাকান্তর কাছে প্রায় মুচলেকা দিয়ে বাঁচল। মলিনার সঙ্গে এই ব্যবহার উদারতার নয়, ভদ্রজনের নয় এমনকি হৃদয়বান মানুষেরও নয়।...আজ মলিনা সুধাকান্তকে দেখে সাধারণ একটু হাসিমুখ করল, হয়তো তার পুরনো কথাটা মনে পড়ছিল।

সুধাকান্তর ইচ্ছে হচ্ছিল, যদি সম্ভব হতো, এখন তিনি তাঁর পয়ত্রিশ বছরের সহকর্মীদের এনে সামনে দাঁড় করাতেন, হলঘরে যেভাবে তারা দাঁড়িয়ে বা বসে ছিল সেই ভাবে। তাদের সামনে

রেখে বলতেন : শুনুন, আপনারা শুনছেন নাকি, শুনুন—আমি, যে-মানুষটি আপনাদের মালাটালা নিলাম, অনেক দামী দামী জিনিসপত্র যাকে দিলেন, আর যাকে আপনারা কর্মযোগী, সৎ, উদার-টুদার কত কি বললেন—সেই মানুষটি আর আমি এক নই। আপনারা একটা সুধাকান্ত চ্যাটার্জি তৈরি করে নিয়েছেন; অবশ্য দোষ আপনাদের নয়, এটা হয়ে থাকে। কিন্তু ভাই বিশ্বাস করুন, আমি অন্য মানুষ, আমার সম্বন্ধে আপনারা প্রায় কিছুই জানেন না। আমি কোনো রকম যোগীটোগী নই; সৎ, উদার, হৃদয়বান, ন্যায়নিষ্ঠ কিছুই নই; আমি খুবই—কি বলব—বিচক্ষণ ব্যক্তি, জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্যে বিচক্ষণতার দরকার হয়, সৎ-টৎ উদার-ফুদার সবই হতে হয় বিচক্ষণতার সঙ্গে, উপকার অপকার তাও বিচক্ষণতার সঙ্গে করতে হয়। আসলে—কি বলব—আসলে উদ্দেশ্য সাধনে সব কিছুই নিমিত্ত করে নিতে হয়। কথাটা ভাই আপনারা বোধ হয় বুঝলেন না; আমিও ঠিক বোঝাতে পারছি না।···মানে, আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি—আমার ধাত বা চরিত্র আপনারা যা বললেন তা নয়, আমি যথেষ্ট ক্লেভার, মাথায় বুদ্ধি রাখি, কোন ঠাকুরের কোনটা মাথায় চড়াবার পাতা তা অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখেছি, আমি সকলকে আপনার করার জন্যে ভদ্র ভাঁড়ামি জানি, ভদ্রলোকের ধাতে সহ্য হয় এমন নীচতা নোংরামি, চালাকি জানি। আর ভাই, এও জানি—দিস ফেয়ারওএল ইজ নাথিং···স্টুপিডিটি···

হঠাৎ চোখের সামনের অন্ধকার যেন একটানে কেউ তুলে নিয়ে আলো করে দিল। সুধাকান্ত চমকে উঠলেন। ক' মুহূর্ত কিছুই ঠাওর করতে পারলেন না। তারপর আলোটা চোখের মণিতে ধরা পড়ল।

"কি গো, এখানে এসে বসে আছ?" সুনয়নী গায়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ঘুম ভেঙে গিয়ে সুধাকান্তকে দেখতে না পেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন সুনয়নী। কোথায় গেল মানুষটা?

সুধাকান্ত কোনো জবাব দিলেন না। আলো না কি অন্য

কিছুর জন্যে তাঁর চোখ জ্বালা করছিল। গলাটা ব্যথা ব্যথা লাগছে, ঠাণ্ডায় না কি অন্য কারণে!

সুনয়নী স্বামীর জন্যে উদ্বেগ বোধ করছিলেন। হলো কি মানুষটার! এভাবে বসে আছে! সারা রাতের ঠাণ্ডা জমেছে ঘরে। চাকরি ছেড়ে এসে প্রথম দিনেই এই!

সুধাকান্তর কপালে বুকে হাত দিলেন সুনয়নী, তাঁর চোখেমুখে ঘুমের ঘোর তখনো জড়ানো, গায়ের শাড়ি এলোমেলো। সুধাকান্তর গায়ের চাদরটা ভাল করে বুকের কাছে জড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, "এখানে এসে বসে কেন গো? কি হলো?"

"ঘুম আসছিল না।" সুধাকান্ত ছোট করে জবাব দিলেন।

বড় করে হাই তুললেন সুনয়নী, চোখ মুছলেন। "প্রথম দিনেই এই!"

"কি?"

"কিছু না।···চাকরি থেকে সবাই বাপু একদিন ফিরে আসে। তোমার দেখছি প্রথম দিনেই ঘুম গেল!···"

সুধাকান্ত প্রতিবাদ করলেন না। গায়ের চাদরের খুঁটে মুখটা মুছলেন। তারপর চুপচাপ।

সুনয়নী স্বামীর পাশে নানান উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে।

বাইরে বুঝি সবে একটি দুটি করে কাক ডেকে উঠছে।

সুনয়নী বললেন, "সারা রাত জেগে?"

"সামান্য ঘুমিয়েছি।"

"বেশ করেছ, নাও শোবে চলো, শরীর খারাপ করবে।" সুনয়নী স্বামীর কাঁধের কাছে হাতটা এমন ভাবে রাখলেন যেন উঠিয়ে নিয়ে যাবেন।

সুধাকান্ত উঠলেন না। বসে থেকে থেকে বললেন, "আলোটা জ্বাললে কেন। নিবিয়ে দাও।"

"শোবে না?"

"না, আজ থাক। শোবার দিন তো পড়েই থাকল।"

সুনয়নী বাতি নিবিয়ে দিতে গেলেন, সুধাকান্ত শুধোলেন, "ক'টা বাজল বলো তো ?"

সুনয়নী সময়টা বলতে গিয়ে পাখিঅলা ঘড়িটার দিকে তাকালেন, তাকিয়ে কেমন অবাক হলেন। "ওগো, তোমার এই পাখি তো···"

সুধাকান্ত ঘাড় ফেরালেন। স্পষ্ট না হলেও অস্পষ্টভাবে তাঁর চোখে পড়ল, পাখিটা থেমে গিয়েছে, ঘড়ির কাঁটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলতে পারছে না, হয়তো কোথাও আটকে গিয়েছে। সুধাকান্ত বললেন, "কোথাও গণ্ডগোল হচ্ছে, সেরে নিলেই হবে।"

সুনয়নী বাতি নিবিয়ে দিয়ে মৃদু একটা আফসোসের শব্দ করতে করতে স্বামীর কাছে এলেন, "যাই বলো, দেবার জিনিস একটু ভাল করে দেখে দিতে হয়।"

সুধাকান্ত নীরব। অন্ধকার যে পাতলা হয়ে আসছে বোঝা যায়, খুব হালকা তরল সাদাটে ভাব মিশছে আঁধারে; হিম-ভেজা বাতাস, প্রত্যুষের কেমন ঝাপসা ভাব জমেছে জানলায়।

অনেকক্ষণ কি রকম এক নীরবতার পর সুধাকান্ত আস্তে গলায় বললেন, "সুনু, একটা কথা বলব ?"

"কিসের কথা গো ?"

সুধাকান্ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন, যেন বলার কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারছিলেন না। শেষে বললেন, "আমি যদি আগে যাই তুমি আমায় কি দেবে ?"

সুনয়নীর সারা গা শিউরে উঠল; রাতভোরে এ কি অলক্ষুণে কথা! তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখ চাপা দিলেন। ছি ছি।

সুধাকান্ত স্ত্রীর হাত অল্প করে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার বড় জানতে ইচ্ছে করছে সুনু, সেই ফেয়ারওএলটায় কে কি দেয়।"

সুনয়নী আর হাত উঠিয়ে মুখ চাপা দিলেন না। হাতটা যেন অসার হয়ে সুধাকান্তর থুতনির কাছে থেমে থাকল।